শহরে ডোরাবাঘ

গঙ্গেশচন্দ্র বিশ্বাস



শহরে ডোরাবাঘ

জীবজন্তু-জঙ্গলের সত্য কাহিনী

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
[স্থাপিত : ১৯৪০]
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড :: কলিকাতা-৭০০০০৭

প্রথম
সংস্করণ

আশ্বিন ১৩৯০

টা. ১২.০০

প্রকাশন : কনকপ্রভা বসু
৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭

মুদ্রণ : লীলা ঘোষ, তাপসী প্রিন্টার্স
৬ শিবু বিশ্বাস লেন, কলকাতা-৬

উৎসর্গ

ভবিষ্যতের অগ্রদূত কিশলয়-পাঠক, যারা এই ধরনের লেখা পেলে খুশি হয়, আর বড়দের যারা বালক-কিশোরদের মন নিয়ে কিশোর-সাহিত্য পড়তে আগ্রহী, তাদের হাতে সাদরে তুলে দিলাম এই বই—

লেখকের নিবেদন

জীবজন্তু নিয়ে আমার গল্প লেখার কোন কথাই নয়। গত চল্লিশ বছরে 'বিচিত্রা', 'বঙ্গশ্রী', 'প্রবাসী', 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান', 'স্বস্তিকা' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় নানা বিষয়ে এখন-তখন আমার কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছে সত্য, কিন্তু কোনদিন জীবজন্তু নিয়ে লেখার কথা ভাবিনি, কারণ ব্যাপারটা ছিল আমার পক্ষে কতকটা অনধিকারচর্চার মতো এবং হাস্যকরও বটে। আমার এই নতুন পথে কিছু দূর অগ্রসর হবার কারণটা একটা দৈব-দুর্ঘটনা বিশেষ। কয়েক-বছর পূর্বে কয়েক মাসের ব্যবধানে আমি কোন এক কিশোর-পত্রিকায় ফুলস্ক্যাপ-কাগজের মাত্র এক পৃষ্ঠার দুটো বিজ্ঞান-ভিত্তিক ছোটদের উপযোগী প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলাম। লেখার সঙ্গে উপযুক্ত ডাক টিকেট দেওয়া ছিল। পত্রিকা-সংস্থার সৌজন্যের সুখ্যাতি করতে হয়; তাঁরা আমার অনুরোধ রক্ষা করে দুটো লেখাই ফেরৎ পাঠিয়েছিলেন। এরপর আমি কতকটা পরিহাসছলেই একটি সত্যঘটনা-ভিত্তিক 'বাঘের গল্প' লিখে পাঠালাম সেই পত্রিকাতেই। কয়েক সপ্তাহ বাদে সম্পাদক মহোদয়ের একখানি ইনল্যাণ্ডের চিঠি পেলাম—"...... লেখাটি আমরা প্রকাশ করব। তবে মাস দুই-তিন দেরী হতে পারে। লেখাটি আমাদের ভাল লেগেছে। ভবিষ্যতে যদি আর একটু ছোট-মাপের এই ধরনের লেখা পাঠান, সুখী হব।"—বাঘের গল্পটি যথাসময়ে প্রকাশিত হয়েছে এবং নানাজনে তার সুখ্যাতিও করেছে। তারপর থেকে সেই পত্রিকায় এবং অন্যান্য কিশোর-পত্রিকায় আমার জীবজন্তুর আরো গল্প ছাপা হয়েছে, হচ্ছে। কাজেই আমি ছোটদের উপযোগী জীবজন্তু-জঙ্গলের গল্পকার হয়ে দাঁড়ালাম।

বইয়ের সব লেখাই সত্য ঘটনার গল্পরূপ। আনুষঙ্গিক পাহাড়-জঙ্গল, গাছগাছালি, নদী-খাল, বন্দুক-রাইফেল এবং জীবজন্তুর নাম

বাস্তব এবং যথার্থ। ঘটনা সত্য হলেও, কোথাও-কোথাও উল্লিখিত মানুষের নাম অলীক।

নানা সূত্র থেকে গল্পসমূহের উপাদান সংগৃহীত। যাঁরা আমাকে এই ব্যাপারে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন, তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রী শৈবাল দাস, সুনীল মাইতি, অজিত কলা, সুনির্মল শাসমল, শশধর কলা এবং আমার এক অগ্রজ, ৺ফণীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়।

বইখানি পাঠকদের ভাল লাগলে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে মনে করব।

আমাদের কথা

(বিশেষ ভূমিকা)

তোমাদের, মানে এই বইয়ের পড়ুয়াদের প্রতি আমাদের, অর্থাৎ বইয়ের পাত্র-পাত্রী জীব-জন্তুদের কিছু নিবেদন আছে। আমরা সকলেই চাই আমাদের নিয়ে বই লেখা হক। যাদের জন্য এই ধরনের বই, তারা জানুক আমরা কোথায় কি অবস্থার মধ্যে বাস করি, কি খাই, কত দিন বাঁচি, আমাদের ছানা-পোনারা কেমন হয়, তাদের আমরা কি-ভাবে মানুষ করি—না, মানুষ করব কেন ছিঃ, বড় করি, কারা-কারা আমাদের শত্রু, কি-ভাবে আমরা তাদের মোকাবিলা করি, আমাদের সমাজ-জীবন বলে কিছু আছে কি-না, আমাদের ভবিষ্যৎ কি—আমাদের এই ধরনের নানা বিষয় নিয়ে কত বই লিখবে লেখ না। কিন্তু মানুষ তেমন বই যত না লেখে তার থেকে অনেক বেশি বই করে আমাদের যমের বাড়ী পাঠাবার, অর্থাৎ তোমরা যাকে শিকার বল, তেমনি সব নৃশংস ঘটনা নিয়ে।

একটা কথা মানুষ কিন্তু একেবারেই ভুলে থাকে—যে-ভগবান মানুষ তৈরী করেছেন, সেই ঈশ্বরই আমাদেরও সৃষ্টি করেছেন। মানুষের যেমন এই পৃথিবীতে জীবন ধারণের স্বাভাবিক অধিকার আছে, আমাদেরও কি তেমন অধিকার নেই? আমরা তো সাধারণত আমাদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানেই বাস করি, আমরা তো বড় একটা লোকালয়ে যাই না। মানুষ থেকে আমাদের চেহারা আর স্বভাবটা একটু আলাদা। মানুষের মধ্যেও কি আর সকলের চেহারা আর স্বভাব এক রকম হয়? আফ্রিকার নিগ্রো আর চীনাম্যানরা কি এক দেখতে, না তাদের চাল-চলন এক রকম? আফ্রিকার কাফ্রিরা নাকি জন্তু-জানোয়ারের কাঁচা মাংস নুন-কাঁচালঙ্কা দিয়ে তারিয়ে-তারিয়ে

খায়, পারবে ভেতো-বাঙালী তেমনি খেতে? মানুষ যেমন আমাদের বাসের জায়গা থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে চিড়িয়াখানা নয়ত সার্কাসে চালান-করে, একটা সময় ছিল যখন তেমনি করে অসহায় মানুষদেরও ধরে-ধরে দেশ-দেশান্তরে চালান দিত সবল-মানুষরা। মানুষ চালান দেবার এই ধরনের প্রথাকে তোমরা নাকি 'দাস-প্রথা' বল। শুনেছি তোমাদের এই প্রথা বন্ধ হয়েছে, কিন্তু আমাদের ওপর জুলুম এখনো চলছেই। মানুষ এমন নির্লজ্জ আমাদের হিংস্র বলে, তাহলে যারা আমাদের মত হিংস্রদের হত্যা করতে পারে, তারা কি আমাদের থেকেও বেশি হিংস্র নয়? মানুষ কারণে-অকারণে আমাদের তো হত্যা করছেই, নিজেদের মধ্যেও হানাহানি করছে তারা। মানুষ প্রতিটি অন্যায় কাজের সপক্ষে আবার একটা করে যুক্তি খাড়া করে, আর তা দিব্বি ধোপে টিকেও যায়। মানুষের সমাজের মধ্যেও চলছে যাকে বলে জঙ্গলের রাজত্ব!

বইয়ের লেখাগুলো পড়লেই বুঝতে পারবে আমরা কেউ কোন অন্যায় করিনি। আমরা কেবল আর দশটি প্রাণীর মত এই পৃথিবীর অফুরন্ত আলো বাতাসের মধ্যে বাঁচতে চেয়েছিলাম মাত্র। কিন্তু তোমরা তা হতে দাওনি। আমাদের অনেক কথা বলার আছে, কিন্তু অত কথা তোমরা শুনতে চাইবে কেন। আজকাল একজন আর একজনের ব্যথা-বেদনার কথা শুনতে চায় না। কিন্তু আমাদের ক'জনার ক'টি মরমের কথা তোমাদের শুনতেই হবে:

আমরা মানসাই-নদীর পূব-পাড়ের জঙ্গলের চিতা-চিতানী। সেবার শীতকালে মাথাভাঙা-শহরে বেড়াতে গিয়েছিলাম আমরা দু'জনে। জায়গাটা ভাল লাগলে সেখানে একটা স্থায়ী আস্তানা গাড়ার ইচ্ছেও ছিল আমাদের মনে। তা আমরা যেখানেই যাই, সেখানেই আমাদের জ্বালাতন করতে লাগল সেখানকার লোকেরা। এরকম অবস্থায় পড়লে তোমরা তাদের সঙ্গে লাঠালাঠি করতে নিশ্চয়। কিন্তু আমাদের তো আর লাঠি ছিল না, আর আমাদের

লাঠি ধরতে শেখায়ও নি কেউ। দাঁত আর থাবাই আমাদের অস্ত্র। তাই খাঁটিয়ে বেয়াড়া লোকগুলোকে একটু শিক্ষা দিয়েছিলাম। জানোইতো বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা। আমরা কারো গায়ে হাত দিলেই তার নানান জায়গায় আঘাত লেগে যায়। তবে আমরা কাউকে মেরে ফেলিনি, একটা বাচ্চার গায়ে একটা আঁচড়ও কাটিনি। আমাদের স্বভাবটা এমনি খিটখিটে যে, কেউ চ্যালেঞ্জ করলে, আমরা সে-চ্যালেঞ্জ গ্রহণ না করে পারি নে। আমি, চিতানী, খালি-হাতেই লড়ছিলাম যতীনবাবুর সঙ্গে। কিন্তু হাতাহাতি লড়াইয়ের মধ্যে মজুরগুলো হুট করে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। মানুষ এমনি নিষ্ঠুর, তারা লড়াইয়ের আইন-কানুনের ধার ধারে না। তবে হ্যাঁ বীর বটে তোমাদের যতীনবাবু। আমাদের দু'জনকেই এক সঙ্গে যমের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে তারা ভালই করেছিল ; পরকালের রাজ্যে আমরা আবার এক সাথেই থাকতে পারছি। কিন্তু আমাদের শরীরগুলো কেমন যেন হাওয়ার মত হালকা আর নিরাকার হয়ে গিয়েছে। আমরা আছি, কিন্তু আমাদের কোন শক্তি নেই। আমরা কেবল উড়ে-উড়ে বেড়াই, কোথাও শান্তি পাইনে।

বুড়ো হলে মানুষকে তোমরা চ্যাংদোলা করে জলে-জঙ্গলে ফেলে দিয়ে আস কি? না, তোমরা তা কর না। তোমাদের মধ্যে কোথাও কোথাও ছোটরা-বড়রা বুড়োদের সেবা-যত্ন করে। তাদের সমাজের এই নিয়মটা খুব ভাল। আমাদের মধ্যে এই জিনিসটা একেবারেই নেই। বুড়ো হতে আমার শরীরটা হয়ে পড়ে ভীষণ ভারি। গাছে-গাছে আর চরে বেড়াতে পারতাম না। মধু আর উই-পোকা আমার খুব প্রিয় ছিল। আগে-আগে আমি মুখ থেকে ভীষণ জোরে হাওয়া বের করে মৌচাক আর উই-ঢিবি দিব্বি ভাঙতে পারতাম। বুড়ো হতে বুকে আর তেমন জোর ছিল না যে, তত জোরে ফুঁ দিতে পারি। ভাল-মন্দ সেবা তো দূরের কথা; আমার প্রাণে বেঁচে থাকাই কঠিন হয়ে পড়েছিল। আমার শরীরটাই ছিল

ঐ-রকম ভারি-সারি দেখতে, কিন্তু খাটুনির কাজ করতে পারতাম না মোটেই। লাটপঞ্চুরে আমার ভালুক-ছেলেমেয়েরা কেউ আমাকে দেখত না। বুড়ো-বয়সে পেটের দায়ে লামা শেরিংয়ের মকাই-খেতে যেতাম খাবারের সন্ধানে। কচি-কচি ভুট্টা খেতে আমি খুব ভাল বাসতাম। তা নরবু লামা আগুন-বমি-করা অস্ত্র দিয়ে একদিন মিটিয়ে দিলে আমার সব খিদে। তবু আমি নরবুর ঘাড়ে হাত দিয়ে তার সঙ্গে মিতালি করতে চেয়েছিলাম। নরবু একটু দূরে ছিল, তা নাহলে তাকেও পরপারের সাথী করে নিতাম।

বৈঠাভাঙা-জঙ্গলে তখন আমার চার-চারটে ছানা। আমার আর ওদের মেনু দিতে ভাল লাগত না। মাংস খেতে শেখাচ্ছিলাম। আমার ইঙ্গিতে ঝোপের আড়ালে চুপটি করে বসেছিল আমার সোনামণিরা। ছানাগুলো হরিণ-বরার মাংস তেমন পছন্দ করত না। তাই সেদিন হাতের কাছে একটা জোয়ান মানুষ পেয়ে বাচ্চাদের এই প্রথম দিতে চেয়েছিলাম মানুষের কোমল মিষ্টি মাংসের স্বাদ। আমি ম্যানেজ করতাম ঠিকই, কিন্তু কাঙাল-নিতাইরা ঝট করে এসে পড়তেই আমার সে-গুড়ে বালি পড়ল। ভাবতে পার আমাকে নিকেশ করতে বাছাদের আমার কি অবস্থা হল! এ-সব কথা কিন্তু গল্পের মধ্যে নেই, কারণ এ-সব কথা লেখক-মশাই ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেন নি। ব্যাপারটা একান্ত গোপনে রেখেছিলাম আমি। কিন্তু দ্যাখো, লেখক-বুড়ো গল্পের কেমন কায়দার নাম রেখেছে, 'বাঘের খপ্পরে ভগবান', যেন সত্যিকারের ভগবানকেই আমি ধরেছিলাম। এমন ধোকা দিতেও পারে মানুষরা! আমাদেরও ভাব আছে, ভাষাও আছে তোমাদের মত নানা রকম। যদি কলম ধরতে পারতাম, তাহলে আমরাও এমন সব মজার মজার গল্প লিখতাম যে তোমরা তা পড়ে তেঁতুল-খাবার মত মুখ চোটকাতে, আর হাসতে-হাসতে গড়িয়ে পড়তে মাটিতে। গল্পের নাম দিতাম, 'লেখকের খপ্পরে সুন্দরী-বাঘ', 'সুন্দরবনে লেখকের উপদ্রব', 'বাঘের মানুষ-ধরা

ফাঁদ, 'শিকারীর কবলে সুঁদরী-কুমির', 'কুমিরখেকো মানুষের শেষকৃত্য' —এমনি আরো কত রকমের কত নাম।

আমি গণেশ সেজেই জন্মাই নি। আমার দুটো দাঁতই ছিল ভারি সুন্দর। এক-একটা দাঁত ছিল প্রায় ছ-ফুট লম্বা, আর ওজন প্রায় ত্রিশ-সের। আমি দলের রাজা হতে চেয়েছিলাম ; হতে পারতামও, যদি দলের গোদা-দাঁতালটার সঙ্গে আমার লড়াইটা আর কিছুদিন পরে হত। এখন বুঝি আমি তখন নিতান্তই নাবালক ছিলাম। নাবালক হলে যা হয়—বুদ্ধি-বিবেচনা কম বলে বুঝতে পারিনি দলের মাথাটার তুলনায় নিজের শরীর আর শক্তির অবস্থাটা। তখন আমার দলপতিকে চ্যালেঞ্জ জানানো ঠিক হয় নি। লড়াইয়ে হেরে যেতেই না আমার মেজাজটা গেল বিগড়ে ; বাইরের জগতের সকলকেই তখন আমার মনে হতে লাগল শত্রু। গাছের ডাল, মানুষ, পশু, সব-কিছুর ওপরেই চালাতে লাগলাম নিজের শক্তির পরীক্ষা। ফুটবলের লড়াইয়ে হেরে গেলে তোমাদের মাথা খারাপ হয় না? ফুটবলের মাঠে কেউ কারো নয়, কেউ কাউকে চেনেও না, তবু সময়-সময় তাদের মধ্যে কি মারপিট, কি মারপিট! তোমরা আবার নিজেদের 'সভ্য' বল—কথাটির আগে একটা 'অ' জুড়ে দিলে যা বোঝায়, তোমরা আসলে অনেকটা তাই! আমি কিন্তু সেদিন সত্যি-সত্যি আত্মহত্যা করতে ফায়ারিং রেঞ্জে ঢুকিনি। আমার মনে শান্তি ছিল না একটুও, তাই ছন্নছাড়ার মতো যেদিকে-সেদিকে ছুটো-ছুটি করতাম। সময় সময় আমার মনে হত আমি বড় একলা, বড় অসহায়। আমি ভাল হয়ে যেতে পারতাম, কিন্তু কি জানো ভাই, আমাকে সান্ত্বনা দেবার মত কেউ ছিল না সেদিকে। সব সময় আমার দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ত। এখন মনে হয়, আমি আর একটা চান্স পেলে ভুঁড়ো গজাটাকে দল থেকে হটিয়ে দিতে পারতাম ঠিক। কিন্তু তার কি আর উপায় আছে!

আমি কেবল একটা কেঁদো-বাঘ হতে যাচ্ছিলাম। নিজের

অবস্থা তখনো ভাল করে বুঝতে শিখিনি। কোচবিহার শহর সফর করতে গিয়ে অক্কা পেলাম অকালে। ভুল করে টাকুয়ামারি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম। তারপর গেঁয়ো মানুষগুলোর তাড়া খেতে খেতে পৌঁছে গেলাম কোচবিহার শহরে। আমি প্রথম তিন-দিন শহরের উত্তরের জঙ্গলটায় না খেয়ে শুয়েছিলাম। বেড়াল মাসীর মত আমরাও খুব খিদে সহ্য করে থাকতে পারি। আমার আর কি-ই বা করার ছিল! আমি তো আর রসগোল্লা সন্দেশ চিঁড়ে মুড়ি খেতে শিখিনি যে দোকানে দোকানে হানা দিয়ে নিখরচায় ভূরিভোজ চালিয়ে যাব? খিদের মুখে রোগা রোগা গরু-ভেড়া যা পেতাম, তাই দিয়ে কোন রকমে দিন গুজরান করতাম। বনের তাজা তাজা হরিণ বরা আর সেখানে পাব কোথায়? তোমরা কতকগুলো শিকারের হাতি দিয়ে ঘেরা-ঘেরি করে আমাকে নিতান্ত লাচার অবস্থায় নিকেশ করলে। জঙ্গল ছেড়ে আসার ভুলের মাশুল আমাকে দিতে হল এই ভাবে। আমি কতবার মনে করেছি দূর ছাই, জঙ্গলে ফিরে যাই! কিন্তু আমার সেই বড় জঙ্গলটা যে কোন-দিকে, আর কত দূরে, সব যেন গুলিয়ে গিয়েছিল; মনে সাহসও ছিল না একটুও। মনে হত কেবল লুকিয়ে থাকি। দু-এক দিন সদরে গিয়েই বুঝেছিলাম, শহরের লোকেরা কি সাংঘাতিক মানুষ!

সেদিন ভেড়ার খোঁয়াড়ে হানা দিতে গিয়ে, চৌমাথার মস্তানদের 'ঐ-যে-বাঘ' চিৎকারটা শুনে আমার তো বাপু ভয়ে পিলে ফাটার দশা! জীবনে এমন অবস্থায় পড়িনি কখনো। যমপুরীতে এসে এখন বেশ বুঝতে পারছি বয়স না পাকতে আমার নিজের চেনা-জানা বন ছেড়ে বেরিয়ে আসাটা মোটেই উচিত হয় নি।

আমি কাজলপাতার এক অজগর বেচারা। খেয়ে না-খেয়ে একলা একলা পড়ে থাকতাম জঙ্গলের ঝোপঝাড়ের মধ্যে। আমি কারো সাতেও থাকতাম না, পাঁচেও থাকতাম না। দুনিয়াতে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক তো আছেই। পর পর খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারটা না

থাকলে পৃথিবীর অবস্থাটা কি দাঁড়াত একবার ভেবে দেখত। মানুষ পোষা সব-রকম প্রাণীর মাংস তো খায়ই, বনের বাঘ-সিংহ ভালুক হাতি শুয়োর সাপ কুমির হাড়গিলে শকুনদেরও রেহাই দেয় না। আমি জঙ্গলের একটা আধমনি বেওয়ারিস বরাহ দিয়ে ডিনার সেরে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিলাম। তাতে কি অন্যায় হয়েছিল বল তো। ব্যাঙ খেলে আমার বিশাল উদরটার একটা কোনাও ভরতে চাইত না ; আমি শুয়োরটা পেটে পুরেছিলাম প্রকৃতির নিয়মেই। কিন্তু তোমাদের মানুষ শুধু শিকারের আনন্দ উপভোগ করার জন্যই আমাকে খতম করলে। উঃ মানুষ কি নির্দয়-নির্মম, আগুনে-গোলা ছুড়ে আমার গোটা মাথাটাই দিলে উড়িয়ে! যমের বাড়ী এসেও আমার সেদিনকার সেই জলুনি আর মরণ-যন্ত্রণার কথা ভুলতে পারিনি।

আমরা ছিলাম বিদ্যা-নদীর পূবের জঙ্গলের এক সুখী ব্যাঘ্র দম্পতি। চোরা-শিকারীদের অত্যাচারে বনের হরিণ বরা কমে যেতে থাকলে আমরা দু'জন চলে এসেছিলাম আমলামিথির অফসাইডের জঙ্গলে। ভেবেছিলাম এ-দিকটায় বুঝি হরিণ বরা থাকে। ক'দিনের মধ্যেই আমাদের ভুল ভাঙল, কিন্তু সেই ভুলের খেসারত দিতে হল ভীষণভাবে! ক্ষিদের জ্বালায় আমরা গাঁয়ের গেরস্তদের গরু-ভেড়া ধরে ধরে খাচ্ছিলাম। দিনের বেলায় বাঁধের ধারের জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে থাকতাম, আর রাত্রির অন্ধকারে গাঁয়ের গোয়ালে-গোয়ালে হানা দিয়ে ছাগল ভেড়া, যেদিন যা পেতাম তুলে নিয়ে চম্পট দিতাম। পাঁচ-সাত দিন ছিলাম বেশ। কিন্তু গাঁয়ের লোকগুলো বাদ সাধল। আমরা যতই চুপেচাপে গাঁয়ের ভেতরে এগোতাম গেরস্তরা যেন কিভাবে ঠিক টের পেয়ে যেত আমাদের শুভাগমনের খবর। লোকগুলো একেবারেই গেঁয়ো। কোথায় আমাদের স্বাগত জানাবে, তা নয়—আগুন জ্বেলে, হৈ-রৈ তুলে, একটা ভীষণ কাণ্ড বাধিয়ে আমাদের পিলে চমকে দিতে লাগল।

লোকগুলো বুঝল না যে, তারা আমাদের রাজ্য থেকে ইচ্ছামতো কাঠ কেটে আনবে, মৌ ভেঙে আনবে, পশু-পক্ষী নিকেশ করে আমাদের জঙ্গল সম্পত্তি ধ্বসিয়ে দেবে, আর আমরা নিতান্ত পেটের দায়ে তাদের ক'টি অখাদ্য ছাগল ভেড়া উদরস্থ করে তাদের খোঁয়াড়-গোয়াল হালকা করে দিচ্ছিলাম, তাতে আমাদের অন্যায়টা কি হল !

আমার সাথীটি কিন্তু বেশ চালাক, বেগতিক বুঝে সময় থাকতে একদিন সে একলাই ফিরে গিয়েছিল তার আগের আস্তানায়। আমি লোভের বশে পড়ে থাকলাম অফসাইড-এ। লোকালয়ের মানুষ নামের জন্তুগুলো যে এরকম সাংঘাতিক হতে পারে, আগে বুঝতে পারলে এমন দুঃসাহসিক অভিযানে আমি পা বাড়াতাম না কক্ষনো। কিন্তু বলিহারি যাই তোমাদের বীরত্বের ! তোমরা চার-দিক থেকে ঘেরাঘেরি করে অজস্র গুলিতে ঝাঁঝরা করে মেরেছো আমাকে। এক গুলিতে সাবাড় করার মতো এলেম ছিল না তোমাদের কারো। আমি কিন্তু তোমাদের একজনকে আমার খালি হাতের এক থাবড়াতেই যমের বাড়ী পাঠাতে পারতাম। সুচরণ না শ্রীচরণ, কি যেন নাম ঐ পাশশিকারীটার—কি বেহায়া বল নচ্ছারটা ! আমি মরণ-যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছি, আর বেআক্কেলটা হারুকে ফের গুলি করার বুদ্ধি দিচ্ছিল ! আমিও তেমনি তাকে দেখিয়ে দিয়েছিলাম আমার কেমন এলেম। কিন্তু আমার তখন গুলিতে গুলিতে শরীরের অর্ধেক রক্ত ঝরে গিয়েছে, তা না হলে হতচ্ছাড়াটা আমার অমন বিশাল হাঁ-টা ঠেকিয়ে রাখতে পারত না কিছুতেই, তার মাথাটা আমি চিবোতাম ঠিক। তখন আমার অবস্থা এমন শোচনীয় যে, মরুণেটা কখন যে আমার এক গোছা গোঁপ উপড়ে নিয়েছিল, তা আমিও বলতে পারব না।

আজ পরলোকে এসে বেশ বুঝতে পারছি আমি আমার নিজের জঙ্গলেই ভাল ছিলাম—মাঝে মাঝে শিকারের অভাবে খেতে না পেলেও সেখানে স্বাধীনভাবে সুখেই ছিলাম বলতে হবে।

আমি সুন্দরবনের নোনাজলের কুমির। জগদ্দল নদীর শাখা-প্রশাখায় চরে বেড়াতাম ; খেতাম হাঙর, মাছ, আর বাগে পেলে গেরস্তর ছাগল ভেড়া। হলপ করে বলতে পারি, আমি কোন বড় মানুষ তো দূরের কথা, মানুষের একটা বাচ্চাও ধরিনি কখনো। তোমরা কি একজন মানুষ খুন করলে, তার বদলে আর একজন মানুষকে ফাঁসিতে লটকাও? কোন্ এক পেটুক কুমির একটা মানুষ ধরল, আর কাকে যে তোমরা কল পেতে খতম করলে, তোমরা তা নিজেরাও জানো না। কি পৈশাচিক কাণ্ড তোমাদের বল! পিটিয়ে পিটিয়ে তিলে তিলে হত্যা করেছ আমাকে। মনুষ্যত্ব বলতে যাদের কোন বোধ নেই, তারা আবার মানুষ নাকি!

আমরা মা বিশালাক্ষীর কৃপায় দলে বলে বেশ ফুলে ফেঁপে উঠে-ছিলাম বৈঠাভাঙা জঙ্গলে। অর্জুনের দলটা জঙ্গলে ঢুকলে আমরা সকলেই ভীষণ খুশি হয়েছিলাম। আমাদের দুই জ্ঞাতি খাল ধারে তোমাদের দলটা দেখে কেমন ভদ্রভাবে সরে গেল, তা কি তোমাদের সেদিনের সেই দলটা ঠিক ঠিক বুঝতে পেরেছিল? সন্ধ্যার দিকে তোমাদের লোকগুলোর সঙ্গে ভাব জমাতে এগিয়ে যাচ্ছিলাম আমরা ক'জন। কিন্তু তোমাদের সেই দলটা এমনি গবেট যে, তারা আমাদের অমন প্রীতির কাজটা পছন্দ তো করলই না, উল্টে আমাদের যার তার দিকে আগুন বমি করা যন্ত্র চালাতে লাগল। আমি বেচারা ছিলাম বনের এক মাতব্বর কছমের শার্দূল। সকলেই আমাকে খুব মান্যগণ্য করত। কাজেই আমি আমার বিজ্ঞজনোচিত বুদ্ধি খাটিয়ে ভাবলাম বাসন্তী নবমীর রাতে ভগবানকে একটা ভাঙা রথে মানাচ্ছে না ; তাই তাকে আমি পার করতে চেয়েছিলাম বৈকুণ্ঠে। ভণ্ড অর্জুন আর তা হতে দিল না, আমাকেই ভবসাগর পার করিয়ে ছাড়ল। আমি দেবীর বাহন ; আমি এই লোকে বসেই সেই পোড়া-কাঠ অর্জুনের মোকাবিলা করার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকব।

আমাদের অনেক কথা বলার বাকি থেকে গেল। শুধু আর

একটি কথা বলেই শেষ করছি আমাদের এই বিলাপ প্রলাপ। মানুষের হাতে যদি আগুন বমি করা ঐ মারুণে অস্ত্রগুলো না থাকত, তা হলে দেখা যেত তারা কত বড় বীর! আজ পৃথিবীতে আমাদেরই রাজত্ব করার কথা, কিন্তু সেখানে কর্তৃত্ব ফলাচ্ছে মানুষ। তারা যে কি করে এই সুবিধেটা পেয়ে গেল ভেবে পাই নে। তবে ইতিহাস পর-পর বদলাচ্ছে। একদিন নিশ্চয় আসবে, যখন মানুষের শহরগুলো সব ধ্বংস হয়ে যাবে, মাটির তলায় চাপা পড়বে তোমরা যাকে বল তোমাদের সভ্যতা, বন জঙ্গলে ছেয়ে যাবে শহর-গ্রাম সব কিছু। তখন আমাদের বংশধররাই হবে জঙ্গলে ভরা সেই সুন্দর পৃথিবীর রাজা-উজির, আমির-ওমরাহ। প্রাণীকুলের জীবন ধারণের পক্ষে পৃথিবীর তখনকার অবস্থাটা এখন থেকে খারাপ হবে না আশা করি।

যমপুরী
তাং ০-০-০

বইয়ের পাত্র-পাত্রী,
বাঘ-ভালুক-হাতি-অজগর
প্রভৃতি জীব-জন্তু।

শহরে জোড়া বাঘ



জঙ্গলে বাঘ থাকে কে না জানে। কিন্তু জঙ্গল ছেড়ে কোন ব্যাঘ্র-দম্পতি যে শহরে জায়গা দখল করতে এগিয়ে আসে, এমন খবর নিশ্চয়ই আশ্চর্যের। না, সার্কাস বা চিড়িয়াখানা বা রূপকথার বাঘেদের কথা নয়, সত্যিকার জঙ্গলের বাঘ-বাঘিনীই এই বাংলা-দেশেরই এক শহরে এসেছিল আস্তানা গাড়তে।

পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। কিন্তু ঘটনাগুলো যেন আজও চোখের সামনে ভাসছে। আমার বয়স তখন দশ কি বার। বাবা তখন মাথাভাঙ্গা ডাকঘরের পোষ্টমাষ্টার। মাথাভাঙ্গা সে-সময়ে কুচবিহার রাজ্যের একটি মহকুমা-শহর। বেঙ্গল-ডুয়ার্স রেলওয়ের পাটগ্রাম স্টেশনে নেমে ভাঙ্গা ইটের রাস্তা দিয়ে সেকালের হাটুরে বাসে নয়ত গরুর গাড়ীতে যেতে হত সেখানে।

তুটি নদী শহরটাকে তিন দিকে ঘিরে থাকত—পুবে মানসাই, পশ্চিম আর দক্ষিণে সুটুঙ্গা। বর্ষায় নদীগুলো বেশ ভারিসারি হলেও, শীতকালে সেগুলো পায়ে হেঁটেই পার হওয়া যেত। মানসাইয়ের ওপারে প্রথমে কাশ, কুল, পানিয়াল ও বাবলার ঝোপঝাড়, তারপর শাল, শিশু, খয়ের, ময়না, পিপল, শিমুল, হরিতকি, বহেরা, চিলৌনি, পানিসাজ প্রভৃতি কাঠ-অকাঠের গভীর বন। এই বনের মধ্যে ছিল কুচবিহার-সদর পর্যন্ত দোআঁশ মাটির একটি অস্পষ্ট গরুর গাড়ীর পথ। বল্লমের গলায় ঝুনঝুনি ঝুলিয়ে তুজন ডাকহরকরা সেই পথে মাথা-ভাঙ্গার ডাক নিয়ে যেত কুচবিহারে। তারা বলত, "ঝুনঝুনির আওয়াজ শুনলে তেনারা বোঝেন আমরা সরকারের লোক, তাই গোলমাল না করে নিজেরাই পথ থেকে সরে যান।" তারা আবার বুঝিয়েও দিত 'তেনারা' মানে জঙ্গলের রাজা-জমিদার, বাঘ, ভাল্লুক, বাইসন—এই সব।

কুচবিহার রাজ্যের মহকুমা-শাসকের পদের নাম ছিল নায়েব-আহিলকার। মাথাভাঙ্গার নায়েব-আহিলকার মাঝে-মাঝে হাতি নিয়ে শিকারে যেতেন মানসাইয়ের ওপারে। আমাদের স্কুলের কাছেই ছিল নায়েব-আহিলকারের জন্য স্টেটের বাংলো। হাকিমের বাসার ধারে যখন বাঘের ছাল ছাড়ান হত, আমরা বিনা বাধায় বাঘের-চর্বি নিয়ে আসতাম, আর তা গলিয়ে বাঘের তেল তৈরী করতাম। বেশ মনে আছে, একদিন হাকিমবাবু একটা দাঁতাল-শুয়োর মেরে এনেছিলেন; সেটা এত বড় ছিল যে, তার

শরীরটা একলাই গরুর গাড়ীর প্রায় সবটুকু জায়গা দখল করে নিয়েছিল।

মাথাভাঙ্গায় হাট হত সপ্তাহে দুদিন—বৃহস্পতি আর রবিবার। একবার বৃহস্পতিবারের হাটের দিনে শহরে একটা বাইসন ঢুকে পড়ে বিস্তর তোলপাড় করেছিল শুনেছিলাম তখনকার বয়স্কদের মুখে। আমি সেখানে থাকা কালেও একবারের যে ঘটনার সাক্ষী হয়ে আছি, তেমন ঘটনার কথা কেবল গল্পের বইয়েতেই দেখা যায়।

বাড়ীতে তখন কার যেন অসুখ। সকাল আটটার-দিকে ডাকঘরের সামনের রাস্তায় বেরিয়েছিলাম মানসাইয়ের এপারের একটি বাড়ী থেকে কিছু কবরেজী গাছ-গাছড়া যোগাড় করে আনতে। কিন্তু কেন জানি না উল্টো দিকের একটা পথ ধরে বেশ কিছুদূর চলে গিয়েছিলাম। দেখি লাঠি-ঠ্যাঙা হাতে নিয়ে লোকজন একদিকে ছুটে চলেছে। ব্যাপার কি না বুঝেই রাস্তার ধার থেকে একটা বাঁশের বাতা কুড়িয়ে নিয়ে আমিও ছুটলাম তাদের পিছু-পিছু। আট-দশ মিনিট ছোটার পর যতীনবাবু উকিলের বাড়ীর সামনে এসে পৌঁছোলাম। দেখলাম দলে দলে লোক উকিলবাবুর বাড়ীর দিকে যাচ্ছে-আসছে, যেন সেদিকে একটা মেলা বসেছে। বাড়ীর কাছাকাছি পৌঁছে শুনতে পেলাম আশপাশের বাড়ীর মেয়েদের কান্নাকাটির শব্দ। যতীনবাবুর বাড়ীর বেঁকি-বেড়ার মধ্য দিয়ে ভেতরের দিকের উঠানে যেতে যেতে দেখলাম তিনি খালি গায়ে বাইরের দিকে বেরিয়ে আসছেন—ফর্সা লম্বা স্বাস্থ্যবান চেহারা, কিন্তু ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত। ভাবলাম বুঝি একটা সাংঘাতিক মারামারি হয়ে গেছে তক্ষুণি। কিন্তু পরমুহূর্তেই ভুল ভাঙল; বেঁকি-বেড়া পার হয়ে ভেতরের উঠানে পৌঁছে দেখলাম, একটা বড় চিতা বাঘ বা বাঘিনী, গায়ে প্রচুর কোপের দাগ নিয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে মাটিতে পড়ে আছে, কিন্তু তখনও তার শরীরের কোন কোন পেশীর স্পন্দন চলছে।

পাশেই ছিল আর এক উকিল দীনবন্ধুবাবুর বাড়ী। লোকের

পিছু পিছু সেই বাড়ীতে গিয়ে দেখি, দীনবন্ধুবাবুও ভীষণ আহত। তিনি একটা বড় তুলোর স্তূপ ডান গালে চেপে ধরে খাটে শুয়ে আছেন, মেঝেতে একটা রক্তভর্তি গামলা। পর পর আরো পাঁচ-সাত জন আহত ব্যক্তিকে দেখা গেল এই পাড়ায়। সকলেই ঘায়েল হয়েছেন বাঘের আক্রমণে। আমার হাতের বাতাটা যে কখন হাত থেকে খসে পড়েছে টেরও পাইনি।

॥ ২ ॥

সম্পূর্ণ ঘটনার বর্ণনা দিতে গেলে একটা বই হয়ে যায়। সংক্ষেপে ঘটনা হচ্ছে, আগের দিন রাত্রিতে ঐ পাড়াতেই একটু দূরের আর এক উকিলের বাড়ীতে কোথা থেকে যেন একটা বাঘ আর বাঘিনী ঢুকে পড়ে একটা খড়ের পালার পাশে চুপচাপ বসেছিল। সময়টা শীতকাল। অনুমান করা যায় বাঘ দুটো মানসাইয়ের ওপার থেকে নদী পেরিয়ে এসেছিল এই শহরে। একে তো শীতকাল, তায় লম্বা রাত্রি—যে যার ঘরে বন্ধ ছিল বলে রাত্রিতে আর বাঘ দুটো কারো নজরে পড়েনি। ঘটনার দিন একটু সকালের দিকে কয়েকটি ছোট ছেলে নাকি ঐ বাড়ীর বাইরে থেকে বাঁশের বেড়ার ফাঁক দিয়ে বাঘ দেখছিল। বাচ্চাগুলো একটু বাড়াবাড়ি করতেই কর্তা-গিন্নী তাদের দখল-করা জায়গা ছেড়ে দিয়ে একসঙ্গে লাফ দিয়ে বেড়ার বাইরের রাস্তায় পড়ে; আর পড়বি তো পড় একেবারে এই উকিলবাবুর এক পিওনের সামনেই পড়ল। বাঘ দুটোর একটা সঙ্গে সঙ্গে পিওনকে আক্রমণ করল, আর একটা রাস্তা দিয়ে সোজা উত্তরদিকে ছুটল। বাচ্চাগুলো কিন্তু বেড়ার ঠিক গায়ে লেগে থাকার জন্য খুব বেঁচে গেল। একেই বলে রাখে কেষ্ট মারে কে!

কুড়ি-পঁচিশ হাত দূরে ছিল আমাদের স্কুলের ফুটবল খেলোয়াড় মাখনদার বাড়ী। মাখনদা তখন তাঁর এক ভাগ্নেকে কোলে করে

বাড়ীর বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন অন্যমনস্কভাবে। ছুটে আসা বাঘটা আক্রমণ করল মাখনদাকে। মাখনদা আক্রান্ত হয়েও তাঁদের বৈঠকখানা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে "দিদি, বাঘ, শীগগির তোর ছেলে ধর," বলে চিৎকার করে ওঠেন ; কোন রকমে দিদির হাতে তাঁর ছেলেকে তুলে দিয়ে বাঘের সঙ্গে ঘরে ঢুকে পড়েন মাখনদা। বাঘের সঙ্গে তাঁর লড়াই হয় মাত্র কয়েক সেকেণ্ড। কোন মুহূর্তে কিভাবে যেন একবার তাঁর ডান হাতটা চলে যায় জানোয়ারটার গলার ভেতরে। মাখনদা বুঝি বাঘটার পেটের ভেতরে হাত চালিয়ে দিয়ে তার অন্নপ্রাশনের-ভাত বের করে আনতে চেয়েছিলেন। বেকায়দার মধ্যে জানোয়ারটার চোয়ালের জোর গেল কমে। বাঘটা বোধ হয় এরকম একটা অভদ্র প্রতিআক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। বিপাকে পড়ে জানোয়ারটা গলার ভেতর থেকে মাখনদার হাতটা কোনরকমে বের করে দিয়ে যেমনি ঝট করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল, তেমনি হুট করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। কথায় বলে বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা, মাখনদার বেলাতেও দেখা গেল তাই—তাঁর ডান হাতের ওপরের দিকটা বাঘের দাঁতের ঘা লেগে লেগে ঝাঁজরা হয়ে গিয়েছে ; তাছাড়াও তাঁর সর্বাঙ্গে ছিল বাঘের আঁচড়-পাঁচড়ের দাগ।

কিন্তু দুটো বাঘই অল্পক্ষণের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। এদিকে পাড়ায় হৈ চৈ পড়ে যায়—বাঘ! বাঘ! যারা দূর থেকে বাঘ দুটো দেখেছিল, তারা বলাবলি করছিল বাঘ দুটো কোন দিকে যেতে পারে। যতীনবাবু তখন তাঁর কাছারি-ঘরে মক্কেল নিয়ে ব্যস্ত। বাইরের উঠানে দু'জন মজুর কুড়ুল দিয়ে কাঠ চেরাই করছে। পাড়ায় হৈ চৈ শুরু হতে দীনবন্ধুবাবুও বাড়ীর বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। পাশাপাশি দুই উকিলবাবুর বাড়ীর মাঝে ছিল গলা পর্যন্ত উঁচু বাঁশের বেড়ায় ঘেরা কয়েক কাঠা পতিত জমি, ভাঙ গাছে ভর্তি। দীনবন্ধুবাবু সেই ভাঙ গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ আঙুল দেখিয়ে বলে ওঠেন—

"ওই যে বাঘ !"

এবারও শহরের জমি দখলে বাধা পেয়ে একটি বাঘ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর ডান গালে মারে এক থাবড়া। তাতেই তাঁর ডান গালের অর্ধেকটা আলগা হয়ে যায়। দীনবন্ধুবাবুর এই দশা দেখে নিকটেই দাঁড়ান তাঁর এক পিয়ন, রামখেলন, চিৎকার করে কেঁদে ওঠে, "বাবুকো তো খা লিয়া"।

বাঘ ঠিক সেই মুহূর্তেই দীনবন্ধুবাবুকে ছেড়ে দিয়ে নিমেষের মধ্যে রামখেলনের কব্জির ওপরের দিকে কামড়ে ধরে। এই সময় যতীনবাবু কাছারি-ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। তিনি কি করবেন স্থির করার আগেই বাঘটা রামখেলনকে ছেড়ে দিয়ে যতীনবাবুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

যতীনবাবু ছিলেন বাঘা যতীনের মতই একজন শক্তিমান পুরুষ। বাঘ লাফিয়ে উঠতেই তিনিও তাকে জাপটে ধরেন। কয়েক-সেকেণ্ডের মধ্যে কি ভাবে যেন বাঘটার মাথা চলে যায় তাঁর বগলের-মধ্যে, আর এই অবস্থায় তিনিও ধস্তাধস্তি করতে থাকেন বাঘের সঙ্গে। মজুর দুটো এগিয়ে এসে মাঝে মাঝেই বাঘটার পিঠে কুডুলের ঘা মারছিল বটে, কিন্তু জন্তুটার অস্থিরতার জন্য খুব সুবিধাও করতে পারছিল না। এই ভাবে কিছুক্ষণ—ক' সেকেণ্ড বা ক' মিনিট বলা মুশকিল—চলার পর বাঘটা ছিটকে মাটিতে পড়ে যায় ; কিন্তু দেখতে-না-দেখতে দাঁড়িয়ে উঠে আবার যতীনবাবুকে আক্রমণ করে। এবার যতীনবাবু দু'হাত দিয়ে বাঘটার দুটো হাত চেপে ধরেন। মজুররা ইতিমধ্যে একটু দূরে সরে গিয়েছিল, তারা আবার এগিয়ে এসে কুড়ুল দিয়ে বাঘটাকে কোপাতে থাকে। এরপর বাঘটা যে পড়ল, আর উঠল না। এটা ছিল বাঘিনী ; লেজ নিয়ে প্রায় সাত ফুট। দীনবন্ধুবাবুকে আক্রমণ করা থেকে বাঘিনীটার মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা ঘটে যায় বোধ হয় দশ মিনিট কি তারও কম সময়ে।

বাঘিনীটা যখন দীনবন্ধুবাবুকে আক্রমণ করে, অন্য বাঘটা তখন

ভাঙ-বাগান থেকে বেরিয়ে আর একটা পাড়ার মধ্য দিয়ে সোজা আধ মাইল দূরের একটা শুকনো খালের ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে গা-ঢাকা দেয়। শোনা যায় বাঘটা যখন এই পাড়ার মধ্য দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল, তার গায়ের ধাক্কা লেগে তু-তিন বছরের কয়েকটা বাচ্চা এদিকে-ওদিকে ছিটকে পড়ে যায়।

তুপুরের দিকে বাঘটাকে মারার জন্য মাথাভাঙার হাকিম হাতি নিয়ে এগিয়ে গেলেন সেই খালটার দিকে। ডাকঘরের কাছেই ছিল খালটার শেষ মাথা, শুরুটা ছিল মানসাই নদীর দিকে। খালের এক-ধার বরাবর একটা রাস্তা চলে গিয়েছিল নদী পর্যন্ত, আর এক-ধারে ছিল খ্রীষ্টান মিশনারিদের জংলা পতিত-জমি। সময়ের হিসেব করে দেখলে দেখা যাবে, বাঘটা যখন খালের জঙ্গলে লুকিয়েছে, ঠিক তখনই ঐ খালের ধারের পথ দিয়ে আমাকে যেতে হত গাছ-গাছড়া আনতে। বাঘটা হয়ত তখন কোন ঝোপের আড়াল থেকে আমাকেই লক্ষ্য করত ল্যাজ নাড়তে-নাড়তে—ওরেব্-বাবা, এখন ভাবতেও যেন শিরদাঁড়া শিরশির করে! হাকিম যখন হাতিতে মিশনারিদের দিক থেকে ধীরে ধীরে খালের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, আমি তখন খালের মাথার ধারের একটা নিম গাছের উপরে উঠে খালের দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম কি হয়। কতকগুলো গাছের আড়ালে পড়েছিল বলে আমি প্রথমে হাতিটা দেখতে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ পর পর তুটো বন্দুকের গুলির আওয়াজ পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে দেখি একটা বাঘ বিত্যুৎগতিতে একটা ঝোপ থেকে আর একটা ঝোপে গিয়ে ঢুকল। খাল-ধারের রাস্তায় তখন বোধ হয় হাটের অর্ধেক লোক দাঁড়িয়ে। কিছু লোক খালের দিকে ছুটে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল, বোধ হয় হাতি থেকে কোন ইঙ্গিত পেয়েছিল তারা। এই সময় দেখা গেল হাতিটা খুব তাড়াতাড়ি খালের মধ্যে নামছে। তখনই আর একটা গুলির শব্দ পেলাম। এবার রাস্তার লোক আবার ছুটল খালের দিকে। বোঝা গেল প্রথম তুটো গুলি খেয়েও বাঘটা ছুটে যায় পরের

ঝোপে ; কিন্তু সেখানে পড়ে গিয়েও আবার উঠতে চেষ্টা করে। ঠিক সেই সময় চলে তিন নম্বর গুলি।

যখন দেখলাম বাঘটাকে বাঁশে বেঁধে উপরে নিয়ে আসা হচ্ছে, তখন আমিও নিশ্চিন্তে গাছ থেকে নেমে এলাম কাছ থেকে বাঘ দেখতে। মনে হয় বাঘটা আট ফুটের কম ছিল না।

শেষ পর্যন্ত বাঘ-বাঘিনীর শহরে ঘর বাঁধার সাধ আর এ-জীবনে মিটলই না।

লাট পঞ্চুরের চোর-ভালুক



হিমালয়ের কোলে সরকারের এমন কিছু পাহাড়ে-বন আছে, যেখানে মানুষ তো যায়ই না, সূর্যের আলোও সেখানে উঁকি দেয় কি-না

সন্দেহ। দুর্গম বলে বনবিভাগ কোন ভাবেই এই ধরনের বনকে কাজে লাগাতে পারে না। বন বিভাগের ভাষায় এই রকম বনকে বলে ভার্জিন ফরেস্ট। এইসব বন যেমন জানা-অজানা নানা গাছে ভর্তি, তেমনি চেনা-অচেনা জন্তু-জানোয়ারও সেখানে অঢেল। সে সব বনে এখনো বাঘে-ভালুকে মড়ি নিয়ে লড়াই হয়, অজগরে জন্তু গেলে, চিতা-বেড়ালের তাড়া খেয়ে ছুটোছুটি করে ময়ূর আর বনমোরগ, পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে বেড়ায় থার ছাগল, সাদা চিতা, কস্তুর, সিরু—সেখানে এখনো চলে যাকে বলে একেবারে জঙ্গলের রাজত্ব।

এমনি কিছু ভার্জিন বন আছে শিভক-রেঞ্জের লাটপঞ্চর বন-এলাকায়। কার্সিয়ংয়ের নীচে যে পাহাড়ে নদীটার নাম মহানদী, তার এক ধারে দার্জিলিংয়ের দিকটায় আছে পাহাড়ের গায়ে-গায়ে কতকগুলো চা-বাগান, আর তিনধরিয়া, মহানদী, গয়াবাড়ী রেল-স্টেশন—এই সবের সোজাসুজি নদীর ঠিক অপর পারেই কালিম্পঙের দিকটায় লাটপঞ্চর বন। শিভক রেঞ্জের রেঞ্জ-অফিস কালিঝোরায়—শিভক রেল-স্টেশন থেকে তিন-চার মাইল কালিম্পঙের দিকে, ঠিক তিস্তার ধারে। লাটপঞ্চর বনের মধ্যে পাহাড়ে-রাস্তার শেষে বনবিভাগ যে বস্তিটা বসিয়েছে, তার নামও লাটপঞ্চর। কালিঝোরা থেকে লাটপঞ্চর বস্তি, এই সাত-আট মাইল পাহাড়ে-পথের ধারে-ধারে বনবিভাগের আর দুটো বস্তি আছে—করমঠ আর শ্বেতিখোলা। বনে-বনে কুলি-মজুরের কাজ পাবার জন্য বিনা-খাজনায় বস্তি-ওয়ালাদের বসিয়েছে বনবিভাগ। বাইরে থেকে লোক এনে বনের ভেতরে কাজ করাতে পারা যায় না বলে বনবিভাগকে বনের জায়গায় জায়গায় বস্তি বসাতে হয়।

লাটপঞ্চর বস্তিতে আছে বনবিভাগের একটা বাংলো, ফরেস্ট-গার্ডের জন্য একটা সরকারী বাড়ী, কুলি-মজুরদের কিছু কাঠের বাড়ী, আর তাদের জন্য পাহাড়ের গায়ে-গায়ে থাক থাক কিছু চাষের জমি। তাতে কখনো ফলে আলু, কপি, বীট, গাজর, টমাটো, আলুবোখরা,

পেঁয়াজ, ফরাস-বীন, লেটুস, আর কখনো ফলে কোয়াস, ঢ্যারস, ভুট্টা এইসব। বস্তির কেউ কেউ দু-একটা নাশপাতি, আপেল আর কমলালেবুর গাছও রেখেছে সখ করে। লাটপঞ্চর-বস্তিটা ছিল চার-পাঁচ হাজার ফুট উঁচুতে; তাই বারো মাসই সেখানে শীত। কালিঝোরা থেকে লাটপঞ্চর যাতায়াতের রাস্তার ধারেই ছিল একটা সিনকোনা বাগান; একটা ছোট হাসপাতালও ছিল সেখানে। কালিঝোরা থেকে প্রথম তিন মাইল বাদে বাকি রাস্তার ধারে-ধারে দাঁড়িয়ে আছে উতিশ, সৌর, আর চেরি-গাছ। নানা-রঙের ফুলে প্রায় বারমাসই সেজে থাকে গাছগুলো। জিপে এই রাস্তা দিয়ে ওপরের দিকে যেতে যেতে মনে হয় সামনেই বুঝি নন্দন কানন।

লাটপঞ্চর বস্তির নীচের দিকে ছিল বড় একটা ভার্জিন বন—এক দিকে আট-দশ মাইল, আর এক দিকে পাঁচ-সাত মাইল। খাড়া পাহাড়, আর তার ঢালে ঢালে ছিল শাল, শিশু, খয়ের, শিমুল, উতিশ, সৌর, কাওলা, চিলৌনি, কাটুস—এই সব কাঠ-অকাঠ আর নানা-রকম গাছগাছালির ঝোপঝাড়। দুর্গম বলে বনবিভাগের কোন লোক কখনো নামত না এই বনে। তবে সময় সময় কোন কোন পথে ভোজালি হাতে পাহাড়ীরা কাঠকুটো ভেঙে আনতে কিংবা জন্তু-জানোয়ারের বাচ্চা ধরতে সে বনে যেত না এমন নয়; কিন্তু তা নিয়ে কেউ কখনো মাথা ঘামাত না। লাটপঞ্চর বস্তির অনেকেই বর্ষাকালে ভুট্টার চাষ করে। ভুট্টাই বলতে গেলে বস্তিওয়ালাদের বারমাসের জলখাবার। কুড়ি পঁচিশ বছর আগে ভুট্টার একটি বড় শত্রু ছিল সেদিকে। ভার্জিন বন থেকে অন্য জন্তু বড় একটা উঠে আসত না বস্তিতে, কিন্তু ভুট্টা ফলতে শুরু করলে, নীচের দিক থেকে পাহাড় বেয়ে ভুট্টা খেতে প্রায়ই চলে আসত গোদা গোদা ভালুক। ভুট্টা-খেতে ঢুকেই ভালুক মটামট ভুট্টাগাছ ভাঙতে থাকে। অমনি সব বস্তিওয়ালা ন্যাকড়ায় আগুন লাগিয়ে তেড়ে যেত ভালুকের দিকে। আগুনকে ভালুক ভীষণ ভয় পায়। আগুনে যে গায়ের লোম হু-হু

করে পুড়ে যায়, সেদিকে তাদের জ্ঞান ছিল টনটনে। এক এক দিন কোনও বস্তিবাসী লাঠির ডগায় ন্যাকড়া বেঁধে তাতে আগুন লাগিয়ে ছুঁড়ে দিত ভালুকের গায়ে। গায়ে লাগলে তেমন জন্তু আর বস্তি-মুখো হত না কোন দিন।

বস্তির লামা শেরিংয়েরও ছিল কাঠা-চারেক ভুট্টা খেত। তার বাড়ীটা ছিল সব থেকে নীচে। খেতটা ছিল থাকবার ঘরের এক ধাপ নীচে, আর তার নীচেই ভার্জিন বনের খাড়া পাহাড়। প্রথম দিকে তার খেতের গাছগুলো ভালভাবেই বেড়ে উঠেছিল ; কারো কোন উপদ্রব ছিল না। কিন্তু যেই না তার গাছে গাছে ভুট্টার ছড়া বেরুতে লাগল, অমনি শুরু হল রঙ-বেরঙের কতকগুলো ছোট ছোট পাখি, আর একটা মস্ত ভালুকের আনাগোনা। পাখিগুলো আসত দিনের বেলায়, আর ভালুকটা রাত্রিতে রাত্রিতে। পাখিগুলো দু-চারটে খেত বটে, কিন্তু নষ্ট করত কম। কিন্তু ভালুকটা দাঁতে আর হাতে একটার পর একটা গাছই ভেঙে ফেলতে লাগল। তার মানে এক-একটা গাছের সঙ্গে পাঁচ-সাতটা ভুট্টার ছড়াও নষ্ট হত। কাজেই শেরিংয়ের কাছে ভালুকের উৎপাতটা অল্পদিনের মধ্যেই অসহ্য হয়ে উঠল। আগুন দেখিয়েও এটাকে জব্দ করা যাচ্ছিল না। রাত নটা-দশটার দিকে বস্তিটা নিস্তব্ধ হলে ভালুকটা চলে আসত বাগানে। আগুন নিয়ে তেড়ে গেলে পালিয়ে যেত নীচে, কিন্তু আবার এসে হানা দিত মাঝরাতে বা শেষরাতে। অন্য ভালুকগুলো কিন্তু আগুন দিয়ে তাড়ালে আর বড় ভিড়ত না সেদিকে। কিন্তু এটা যে কেন এমন মরিয়া হয়ে বার বার ছিঁচকে চোরের মত বাগানে আসত, তার কোন কারণ বোঝা যাচ্ছিল না। শেরিং বিরক্ত হয়ে স্থির করল জানোয়ারটাকে খতম করতে হবে। কিন্তু বন্দুক ছাড়া এ রকম একটা জানোয়ারের মোকাবিলা করা মুশকিল।

দিনের বেলায় জন্তুটা সেরেফ নিপাত্তা হয়ে থাকে নীচের পাহাড়ে—কোথায় কে জানে। নীচের বনে পাহাড়ের ঢালে ঢালে ঘোরাফেরা করা

খুবই কঠিন, তাছাড়াও ভয় আছে অজগর কিংবা চিতার পেটে যাবার ; কোন ভালুকের খপ্পরে পড়াও আশ্চর্যের নয় ; সময় সময় পাহাড়ে ভালুক মাংসও খায়। শেরিং একদিন ফরেস্ট গার্ড নিমু লামাকে বলল তার দুরবস্থার কথা। নিমু কালিঝোরায় গিয়ে রেঞ্জারবাবুকে জানাল সব ঘটনা। রেঞ্জারের একটা টুয়েলভ-বোর দোনলা বন্দুক ছিল ; গুলিও ছিল রকম-রকম। রেঞ্জাররা সরকার থেকেই বন্দুক গুলি পান। নিমু নিবেদন করল, সাহেব যদি তাকে তাঁর বন্দুকটা আর কিছু এল-জি কার্তুজ দেন, তবে সে নিজেই জানোয়ারটাকে নির্ঘাত যমের বাড়ী পাঠাতে পারবে।

রেঞ্জার একজন বাঙালী। একটা তেজী সটগানের মালিক হলেও, তিনি জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ার হত্যা করা পছন্দ করতেন না। তিনি নিমুর প্রস্তাবে রাজী হলেন না ; কিন্তু অবস্থা বিবেচনা করে বললেন,

"শিকারী নরবু লামা ছনি, তিসকো পাস দোনলা বন্দুক পনি ছ ; তিঁয়ো ভালুকোবাত শুনেও ভনে ছিট আউঞ্ছত। ভালু হোস কি বাঘ হোস, তিঁও আয়ের মারি দিঞ্ছ। নরবু শিপাল শিকারী"।— বহুদিন দার্জিলিং আর ভুটানের পাহাড়ে থেকে থেকে পাহাড়ীদের ভাষা অনর্গল বলতে পারতেন তিনি।—নিমুকে তিনি যা বললেন, তার অর্থ হচ্ছে, "শিকারী নরবু লামার কাছে দোনলা বন্দুক আছে। সে ভালুকের কথা শুনলে তাড়াতাড়ি চলে আসবে ; ভালুক হোক, আর বাঘ হোক, সে এসে মেরে দেবে। নরবু একজন ভাল শিকারী"।

নরবুর বাড়ী ছিল শিভক রেল-স্টেশনের কাছেই। খবর পেয়ে সে এসে দেখা করল রেঞ্জারের সঙ্গে। রেঞ্জারবাবু তাকে বুঝিয়ে দিলেন কোথায় কী করতে হবে। নরবু সেইদিনই বিকেলের দিকে পৌঁছে গেল লাটপঞ্চর বস্তিতে। বস্তিটা নরবুর অচেনা নয়, তবে শেরিংয়ের বাড়ীটা কোথায় তা তার জানা ছিল না। ফরেস্ট-বাংলো পেরিয়ে হাতির মাথার মত একটা ন্যাড়া পাহাড়ের ওপর দিয়ে কিছুটা থাক্-থাক সিঁড়ির মত, আর কিছুটা উৎরাইয়ের পথে নেমে যেতে হয়

শেরিংয়ের ডেরাতে। বাড়ীটা বস্তির সব থেকে নীচে। শুধু তাই নয়, সব থেকে শেষের বাড়ীও বটে। তার ডেরাতে বাঘ-ভালুক সবই আসতে পারে ; তার ভাগ্য ভাল, কেবল ভালুকই আসে। ভালুকটা কোন্ কোন্ জায়গা দিয়ে ওঠা-নামা করে, নরবুকে তা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাল শেরিং।

ওদিকে নিজের এলাকার বস্তিতে গুলি চলবে ভেবে রেঞ্জারবাবু একেবারে উদাসীন থাকতে পারলেন না। একটা পাহাড়ে-ট্রাকে সন্ধ্যার পরপরই তিনিও পৌঁছে গেলেন লাটপঞ্চর ফরেস্ট বাংলোয়। তিনি সেখানে পৌঁছোতেই নরবু এসে দেখা করল তাঁর সঙ্গে। নরবু রেঞ্জারবাবুকে বোঝাল কী করে সে ভালুকটাকে মারবে। বন্দুকের নলের ডগায় একটা সাদা কাপড়ের টুকরো বেঁধে ভালুকটার কাছাকাছি গিয়ে বন্দুকটা নাড়াতে থাকবে। কাপড়ের টুকরোটা দেখতে পেলেই ভালুকটা দাঁড়িয়ে উঠে হাঁ করে তার সামনের দিকে এগিয়ে আসতে থাকবে দুহাত বাড়িয়ে, যেন কোলাকুলি করবে এমনি তার ভাব। শুধু নলটা নড়ালে সেটা তার নজরে না-ও পড়তে পারে। না দাঁড়িয়ে উঠলে সেটাকে কায়দামত গুলিও করা যাবে না। সমস্ত প্ল্যান বুঝিয়ে দিয়ে নরবু চলে গেল শেরিংয়ের বাড়ীতে। বর্ষাকাল। তায় দার্জিলিং-কালিম্পঙের পাহাড়। সমস্ত দিন বৃষ্টির পর বিকেলের দিকে কিছুক্ষণ বন্ধ থাকলেও, নরবু শেরিংয়ের বাড়ী পৌঁছোবার পর আবার ঝির ঝির করে বৃষ্টি নামল। নরবুর জন্য খাবার এলো বাংলো থেকে। রাত আটটার মধ্যে ওরা খাওয়া-দাওয়া মিটিয়ে নিল। শেরিং একটা ভোজালি আর তিন সেলের টর্চ, আর নরবু তার বন্দুক-গুলি নিয়ে প্রস্তুত হয়ে বসে রইল ঘরের মধ্যে, একটা আধ-ভেজানো জানালার পাশে। জানালা দিয়ে শেরিংয়ের মকাই খেতের বেশির ভাগ অংশই দেখা যাচ্ছিল না ভাল মত। জ্যোৎস্নাপক্ষ হলেও গোটা আকাশ ছিল একঢালা সাদা মেঘে ঢাকা। তখনো বৃষ্টি পড়ছে অঝোরে। দূরে দূরে দৈত্য-দানবের প্রাসাদের মত মাথা উঁচু

করে দাঁড়িয়ে আছে বন-জঙ্গলে ভর্তি কালো কালো ছায়ার মত পাহাড়-পর্বত। নীচে জমাট অন্ধকারের কাঁথা মুড়ি দিয়ে ভার্জিন বনটা পড়ে আছে কত জানা-অজানা জন্তু-জানোয়ার আর বিভীষিকা বুকে নিয়ে। বাংলোয় বসে তখন ঝিমুচ্ছিলেন রেঞ্জার সাহেব। রাত যখন প্রায় দশটা, লাটপঞ্চরের রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ করে রেঞ্জার সাহেবের কানে এল বন্দুকের শব্দ। শব্দটা কোথায় হল, কেন হল বুঝতে কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগল তাঁর; ঝিমুতে ঝিমুতে ভুলেই গিয়েছিলেন তিনি যে ভালুক মারতে এসেছেন। যখন তাঁর খেয়াল হ'ল নরবু নীচে গিয়েছে শেরিংয়ের মকাই খেতের দুশমন হঠাতে, তখন তিনি একটা টর্চ দিয়ে ফরেস্ট গার্ড নিমুকে পাঠালেন শেরিংয়ের বাড়ীর দিকে। নিমু তখন বাংলোতেই সাহেবের দেখাশোনা করছিল। কিছুটা নীচে নামতেই নিমু দেখতে পেল লামা শেরিং নিজেই তাড়াতাড়ি ওপরের দিকে উঠে আসছে। নিমুর সঙ্গে শেরিং বাংলোয় পৌঁছে যা জানাল তা হচ্ছে—ভালুকটা মরেছে, কিন্তু নরবুকেও ঘায়েল করেছে শয়তানটা। নরবু পড়ে আছে ভালুকটার পাশেই।

শেরিংয়ের কথা শুনেই রেঞ্জারবাবু টর্চ হাতে ছুটলেন শেরিংয়ের বাড়ীর দিকে। বৃষ্টির সময় পাহাড়ে-রাস্তায় চলা যে কেমন বিপজ্জনক, সে-কথা ভুলে গিয়ে রেঞ্জার সাহের সিঁড়ির মত পথটায় তাড়াতাড়ি চলতে গিয়ে পা হড়কে পড়ে গেলেন, আর পাঁচ-সাতটা সিঁড়ির ওপর দিয়ে স্লিপ কেটে একটু বেশি তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেলেন একেবারে সিঁড়ির শেষের দিকের চাতালে। তার পরণে মোটা খাকির ট্রাউজার আর লেদার জ্যাকেট থাকায় কিছুটা কাদা মাখামাখি হলেও তাঁর শরীরে বিশেষ আঘাত লাগেনি। ভুট্টা খেতে পৌঁছে রেঞ্জার বাবু দেখতে পান খেতের একেবারে ধারে—যার পরেই নীচের দিকে নেমে গেছে ভার্জিন বন—ভালুকটা মরে পড়ে আছে; তার মাথার কাছের মাটি লাল হয়ে আছে রক্তে। ভালুকটার তিন-চার হাতের মধ্যেই

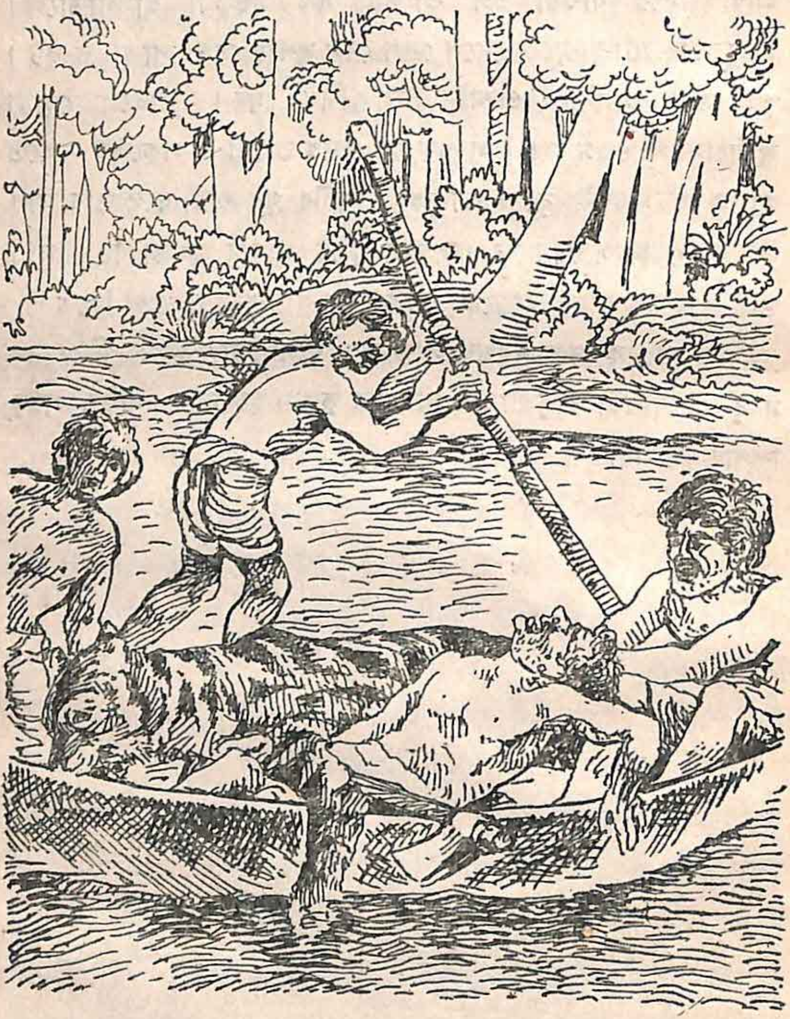
পড়ে আছে শিকারী নরবু লামা, তারও মাথার কাছের মাটি লাল। তখনো তার অল্প অল্প জ্ঞান আছে, কিন্তু কথা বলতে পারছে না।

শেরিং তখন সব ঘটনা খুলে বলল। রাত দশটার দিকে বৃষ্টিটা যখন একটু ধরেছে, সেই সময় ভালুকটা খেতের মধ্যে ঢুকে ভুট্টা গাছ ভাঙতে শুরু করে। আস্তে আস্তে ঘরের দরজা খুলে বন্দুক হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে নরবু। পেছনে পেছনে ভোজালী আর টর্চ নিয়ে এগিয়ে গেল শেরিং। ভালুকটা তখন মকাই গাছ ভাঙছিল। খেতের মধ্যে জল কাদা ছিল বলে তারা একটু ঘুরে আস্তে আস্তে ভালুকটার আট-দশ হাতের মধ্যে এসে পড়ল। শেরিং তখন নরবুর প্রায় পাঁচ হাত পেছনে। নরবু বন্দুকের নলটা নাড়তে নাড়তে ধীরে ধীরে এগুতে লাগল ভালুকের দিকে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে নলের ডগার কাপড়ের ফালিটা পড়ে যায় জন্তুটার নজরে। অমনি সেটা দাঁড়িয়ে উঠে থপ থপ করে নরবুর দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। জন্তুটার মাথা তখন নরবুর মাথা থেকে দু-তিন ফুট উঁচুতে। ভালুকটা ঠিক হাঁ করে এগিয়ে আসছিল। নরবু দুটো হাতই যতটা সম্ভব বন্দুকের পেছনের দিকে রেখে নলের মুখটা ভালুকটার হাঁ-করা মুখের কিছুটা কাছে নিয়ে গিয়ে এক সঙ্গে দুটো ট্রিগারই টিপে দিল। গুলি করার ঠিক আগের মুহূর্তে শেরিং টর্চ ফেলেছিল ভালুকটার মুখে, কিন্তু তাতে শিকারীর খুব সুবিধে হয়নি। মুখের একেবারে ভেতরে নল ঢোকান সম্ভবই ছিল না, কেননা ভালুকটা এত বড়, আর তার হাতগুলো এমনই লম্বা ছিল যে, সে তখন তার একটা হাত বাড়িয়ে নরবু লামার ঘাড়ে হাত রেখে মিতালি পাতাবার চেষ্টা করছিল। গুলিতে কাজ হল ঠিকই ; গুলি খেয়ে বিরাট এক গোরিলার মতো সেই জাম্ববান একটা ভয়ঙ্কর চিৎকার দিয়ে মাটিতে পড়ে গেল, পড়তে পড়তেও নরবুর ঘাড়ের ওপর তার ডান হাতের বিরাট আঙুলের নখ বুলিয়ে দিল একবার, তাতেই নরবুর ঘাড়ের চামড়া আর কিছু মাংস ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল।

লোকজন ডাকাডাকি করে নরবু আর ভালুকটাকে নিয়ে যাওয়া হল বাংলোতে। সেই রাত্রিতেই নরবুকে পাঠিয়ে দেওয়া হল সিনকোনা বাগানের হাসপাতালে; পরদিন সকালে সেখান থেকে আবার নিয়ে যাওয়া হল কাছের এক মহকুমা হাসপাতালে। ভালুকটার ল্যাজা-মুড়ো মেপে দেখা গেল লম্বায় সেটা পাক্কা ছ-ফুট। শুধু তার ছালটার ওজনই ছিল ত্রিশ সের। তাহলে গোটা জাম্ববানটার ওজন কত ছিল একবার ভেবে ছাখো। সকলেই বলতে লাগল সেটা একটা বুড়ো ভালুক। শরীর খুব ভারী বলে তার আর জঙ্গলের কোন গাছে চড়ে ফুল-ফল খুঁটে খাবার ক্ষমতা ছিল না। তাই তার নজর ছিল মানুষের তৈরী খেত-খামারের ফসলের দিকে।

মাসখানেক বাদে নবজন্ম লাভ করে হাসপাতাল থেকে ফিরে এল নরবু। শিকারী নরবু লামার সাহসের তুলনা হয় না। সত্যি, নরবু শিপাল শিকারী।

বাঘের খপ্পরে ভগবান



সন-তারিখ মনে নেই—অনেক দিন আগেকার কথা তো। একবার মৈপিঠে ভীষণ বাঘের উপদ্রব দেখা দিল। মৈপিঠ হল দক্ষিণ চব্বিশ-পরগণার মধ্যে কুলতলী থানার একটি বড় গ্রাম। ডায়মণ্ডহারবার থেকে

লঞ্চ আর বাসে যেতে হয় সেখানে। ডায়মণ্ডহারবারের দীনদাবাবুদের একটা লাট-কাছারি ছিল এই গ্রামে। এই গ্রামের পুবে রয়েছে ঠাকুরান নদীর একটা ফ্যাকড়া—জোয়ারের সময় ফুলে উঠে বেশ চওড়া হয়, আবার ভাটার সময় শুকিয়ে গিয়ে সরু হয়ে পড়ে। তাছাড়া বর্ষা আর চোত-বোশেখের বাড়া-কমার ব্যাপার তো আছেই। নদীটার ঠিক পুবেই বৈঠাভাঙা রিজার্ভ-ফরেস্ট। জঙ্গলটা যেমনই গরাণ, বানী, ক্যাওড়া, সুন্দরী, গামা, হেঁতাল গাছে ভর্তি, সুন্দরবনী কেঁদো বাঘেও সেটা ছিল তেমনি ঠাসা। সুযোগ পেলেই রাত্রির অন্ধকারে দক্ষিণরায়ের এই বেআদব চেলারা কেউ কেউ ঠাকুরান পেরিয়ে চলে আসত মৈপিঠে, আর গরু, ছাগল, মানুষ, যখন যাকে পেত, মুখে করে অনায়াসে নদী সাঁতরে আবার জঙ্গলে ফিরে গিয়ে ভোজ লাগাত মহানন্দে। যারা সদলে বৈঠাভাঙা জঙ্গলে যেত কাঠ-কুটো ভেঙে আনতে, তাদের মধ্যেও কেউ কেউ প্রাণ দিত বাঘের হাতে। সেখানকার বাঘগুলো ছিল এমনি বেপরোয়া যে, দিনের বেলাতেও কোন কোন কাঠুরেকে সরাসরি আক্রমণ করে বসত।

যে বছর মৈপিঠে ভীষণ বাঘের উপদ্রব চলছিল, সেই বছরই ফাল্গুন মাসে ঐ গ্রাম থেকেই ভগবান, কাঙাল, নিতাই, আর গোবরা—এই চারজন বৈঠাভাঙা-জঙ্গলে গিয়েছিল কিছু কাঠ কেটে আনতে। এরা সবাই ছিল দীনদাবাবুদের ভাগচাষী। গ্রাম থেকে জঙ্গল ছিল মাইল দেড়েক দূরে। একটা ডিঙিতে হাত-দা, দড়ি, কুড়ুল, ঝুড়ি আর ছোট ছোট মাটির ভাঁড়ে খাবার জল নিয়ে তারা যখন নদীর ওপারে জঙ্গলের ধারে পৌঁছোল, বেলা তখন দশটা কি এগারটা। নদীর ঠিক ধার থেকেই শুরু হয়েছে জঙ্গল। কিন্তু একেবারে বনের ধারে কাটার মত গাছ না পেয়ে ওরা একটা খালের মধ্য দিয়ে জোয়ার ধরে ডিঙিটাকে নিয়ে গেল বনের আরো সিকি মাইলটাক ভেতরে। বনের ভেতরটা ওদের মোটামুটি জানা ছিল। সেখানেই নেমে পড়ল তারা। খালের ওপর ঝুঁকে পড়া একটা গামা গাছের সঙ্গে ডিঙিটা

বেঁধে রেখে ওরা উঠে এল একটা ধলের মধ্যে। ধল হচ্ছে বনের ভেতরে বড় বড় ফাঁকা জায়গা। কোন ধলে বানী-গরাণের চারা থাকে ; আবার ফুটা-ধলে মানুষের টাক মাথার মতো কোন গাছই থাকে না। ভগবানদের এই ধলে ছিল বানী গাছের চারা। সম্পূর্ণ ধলটার ওপরে জমে ছিল একটা পুরু নুনের স্তর। বড় কোটালের সময় খালের নোনা জলে ডুবে যায় ধলটা ; রোদের তাপে সেই জল শুকিয়ে গেলে ধলের মাটিতে ফুটে ওঠে গুঁড়ো গুঁড়ো নুন ; এই ভাবে বছরের পর বছর ধলে জমতে থাকে স্তর স্তর নুন। চোত-বোশেখের দুপুরে নুনের জন্য ধলের জমি এমন তেতে ওঠে যে, তার ওপর দিয়ে তখন খালি পায়ে মানুষের পক্ষে হেঁটে চলা কঠিন হয়ে পড়ে। তখন ফাল্গুন মাস হলেও ধলের মাটি বেশ তেতে গিয়েছে। ধলের ওপারে ছিল বড় জঙ্গল ; কিন্তু এ-পারেও ছিল মেলাই বানী-গরাণ-সিঁদরী। ধলের এ-পারের জঙ্গলেই কাটার মত কয়েকটা গাছ ঠিক করে নিল তারা। গাছ বাছাই করতে গিয়ে তারা ছাড়াছাড়া হয়ে পড়ল একজন থেকে আর একজন। তাদের মধ্যে আবার ভগবানের গাছটাই ছিল একটু বেশি দূরে—সব রকম গাছের ভিড়ও ছিল সেখানেই বেশি। তা হলেও ডাক দিলে আর তিনজন শুনতে পায় কি না, তা তারা আগে থেকেই কুই-ডাক ডেকে বুঝে নিল—বনের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে কাঠুরে-শিকারী-মৌলিরা কেউ কারো নাম ধরে ডাকাডাকি করে না। যারা কাঠ কাটে তাদের যেমন বলা হয় কাঠুরে, তেমনি যারা সুন্দরবনের মৌচাক ভেঙে মধু নিয়ে আসে, তাদের বলে মৌলি। ভগবান একটা গরাণ-গাছ বেছে নিয়ে তাতে আট-দশটা কুড়ুলের কোপ বসাবার পরেই দেখতে পেল, তার সামনের দিকে প্রায় হাত পনর দূরে একটা কাঁটা ঝোপের ধারে মূর্তিমান যমের মতো একটা সুঁদরী-বাঘ বসে আছে তার দিকে তাকিয়ে—বসে বসে মতলব কষছে কিভাবে তাকে আক্রমণ করবে। ভগবান গাছের পেছনে থাকায় বাঘটা সরাসরি তার ওপর ঝাঁপিয়েও পড়তে পারছিল

না। ভগবানের তখন আত্মরক্ষার জন্য করার ছিল না কিছুই। ছুটে পালাতে গেলে লাফিয়ে এসে বাঘ তার টুঁটি চেপে ধরবে। কুড়ুল বাগিয়ে সোজাসুজি বাঘটাকে চ্যালেঞ্জ জানানোও ছিল অসম্ভব; তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে কুড়ুল সুদ্ধ তাকে ফেলে দেবে মাটিতে। তবে গাছে উঠে পড়তে পারলে যমটাকে কলা দেখাতে পারত ভগবান—সুন্দরবনী বাঘ গাছে উঠতে পারে না। কিন্তু মানুষ তো আর হনুমান নয় যে, এক লাফে গাছে উঠে পড়বে। গাছে উঠতে গেলেও বাঘটা ভগবানকে ধরে ফেলার সুযোগ পেয়ে যেত। তাই মন্দের ভাল বাঘটাকে দেখতে পেয়েই ভগবান গাছের আড়ালে এসে দাঁড়াল, যাতে জানোয়ারটা সরাসরি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে না পারে। কিন্তু নখ-ছাল-লোম শূন্য এমন কোমল নরমাংসের লোভ বেশিক্ষণ দমন করেও থাকতে পারল না বাঘটা। মিনিট-খানেক ভগবানকে সেই ভাবে লক্ষ্য করতে করতে এক সময় ছুটে এসে ভগবানের বাঁ-কাঁধের আর হাতের জোড়ের জায়গায় কামড়ে ধরল, আর সামনের দিকের ডান পায়ের থাবা বসিয়ে দিল ভগবানের পিঠের বাঁ-দিকে। দারুণ বিপদের মধ্যে পড়েও কিন্তু ভগবান হাল ছাড়ল না; সেই অবস্থাতেই বাঁ হাত দিয়ে শক্ত করে গরান গাছটা জড়িয়ে ধরে ডান হাত দিয়ে বাঘটার পিঠে যতটা সম্ভব জোরে-জোরে কুড়ুলের কোপ ঝাড়তে লাগল একটার পর একটা। কিন্তু গাছ-কাটা একটা ভারী কুড়ুল যে এক হাতে চালান কেমন সুবিধার কাজ, যে তেমন কুড়ুল হাতে নিয়েছে, সে তা সহজেই বুঝতে পারবে। ভগবানের অনেক জঙ্গলের অভিজ্ঞতা ছিল, অনেকবার এর-তার পাশ-শিকারী হিসাবে শিকারেও গিয়েছে, কিন্তু এ-রকম বিপদে পড়েনি কখনো। শিকারীর সহকারীকে পাশ-শিকারী বলে। ভগবান ঐভাবে বাঘের পিঠে ডান হাত দিয়ে কুড়ুলের কোপ বসাতে বসাতেই চিৎকার করে বলতে লাগল, "এই তোরা সব কে কোথায় আছিস, আমাকে বাঘে খেয়ে ফেলল রে! মরে গেলাম, মেরে

ফেলল ; মেরে ফেলল!”—বাঘটা কিন্তু কুড়ুলের কোপ খেয়েও ভগবানকে ছাড়ছে না, কেবল গর-গর গোঁ-গোঁ শব্দ করছে। ভগবানের ডাক-চিৎকারে কাঙালরা তিনজনেই ছুটে এসে দেখে ভগবান আর বাঘে ভীষণ লড়াই চলছে তখন। নিতাই আর গোবরা প্রথমের দিকে ভয়ে কাঠ হয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকল। কিন্তু কাঙাল সাহসী লোক। সেও ভগবানের সঙ্গে অনেক শিকারে গিয়েছে শিকারীদের সাহায্য করতে। সে ছুটে এসে দু-হাতে কুড়ুল তুলে বাঘটার মোটা ঘাড়ের ওপর ঝাড়ল এক প্রচণ্ড কোপ ; কিন্তু কুড়ুলটা বাঘটার ঘাড়ের হাড়ে এমন ভাবে বসে গেল যে কাঙাল সেটা আর তুলতেই পারল না সেখান থেকে। কাঙালের সেই বেকায়দার অবস্থা দেখে নিতাই এবার সাহস করে এগিয়ে গিয়ে কাঙালের কুড়ুলের পাশে বসিয়ে দিল আর এক বেঢপ কোপ ; ফলে কাঙালের কুড়ুলটা এবার গেল খুলে—দু-জন মজুর মিলে কাঠ চেরাইয়ের সময় যে-ভাবে কুড়ুল বসায় আর ওঠায়, ঠিক সেই রকম আর কি। বাঘটা তখনো ভগবানের কাঁধে দাঁত বসিয়েই রেখেছে—আশ্চর্য এই সুঁদরী বাঘের জেদ আর লোভ! কাঙালের কুড়ুল খুলে যেতে সে তখন বসিয়ে দিল আর এক কোপ। বাঘটা ভগবানকে কামড়ে ধরার পর থেকেই গোঁ গোঁ করে গজরাচ্ছিল। কাঙালের এক কোপ খেয়েও তার গজরানি থামে নি। কিন্তু নিতাইয়ের কোপ পড়তেই বন্ধ হল তার গোঁ-গোঁ শব্দ। ভগবান তখন নিজের আর বাঘের রক্তে স্নান করছে। পর পর তিন-চারটে কুড়ুলের কোপ পড়তে বাঘের গলা যখন দু ফাঁক হতে আর অল্পই বাকি, ভগবান আর বাঘ, দুটিতেই পড়ে গেল মাটিতে—ভগবানের তখন আর জ্ঞান নেই।

ওদের কাঠ কাটা পড়ে থাকল। তাড়াতাড়ি ভগবানকে ধরাধরি করে ডিঙায় এনে তুলল কাঙালরা তিনজনে। কোন রকমে বাঘটাকেও তোলা হল ডিঙায়। সেটা বাঘ নয়, বাঘিনী। তাই বোধ হয় তার তেজ ছিল ঐরকম সাংঘাতিক। ঘণ্টা-খানেকের মধ্যে

ভগবানকে নিয়ে যাওয়া হল মহকুমা-শহর ডায়মণ্ডহারবারে, সেখান থেকে আবার কলকাতায়।

মাস-খানেক বাদে ভগবান ফিরে এল গ্রামে। তার বাঁ-হাতটা কেটে বাদ দিতে দিতেও শেষ পর্যন্ত সার্জনরা দয়া দেখিয়েছে তাকে। হাতটা আর কাটে নি। কিন্তু হাতটা টিকে গেলেও সেটা অনেকটা বিকল হয়ে রইল। শুধু ভগবান নামটার জন্যই বোধ হয় একটা আসল সুন্দরবনী বাঘের খপ্পরে পড়ে গিয়েও সেবার প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল ভগবান।

গণেশের আত্মহত্যা



বেশি দিন আগেকার কথা নয়। চীন-ভারত যুদ্ধ কেবল শেষ হয়েছে, কিন্তু তখনো আসামের পাহাড় আর জঙ্গলের পথে সৈন্যদের মালবাহী অশ্বতর-বাহিনী, জোঙা-জিপ, আর তেলের ট্যাঙ্কারগুলো ছুটোছুটি করছে দিনরাত। আজকের অরুণাচল প্রদেশ তখন নর্থ-ইস্ট-ফ্রন্টিয়ার এজেন্সি বা নেফা নামে পরিচিত। নেফার পাঁচটা বিভাগের

একটার নাম সুবনশিরি। উত্তর-লখিমপুরের বন-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যে-পথটা চলে গিয়েছে এই বিভাগের ভেতরের দিকে, তারই এক-জায়গায় একটা নদীর কাছাকাছি ছিল আমাদের একটা ছোট ছাউনি। সেখান থেকে ছু' মাইলের মধ্যে শুরু হয়েছে হিমালয়ের চড়াই, যাকে ইংরেজীতে বলে ফুট-হিল্‌স্। পাহাড়ের যে দিকটা দিয়ে নদীটা সমতলে নেমে এসেছে, তার খুব কাছেই ছিল আমাদেরই মালবাহী ঘোড়া, খচ্চর, জিপ, ট্রাক—এই-সবের আর একটা ছাউনি। এদিকে সেদিকে জওয়ানদের ছাউনি ছিল আরো তিন-চারটি। আমাদের ছাউনিতে হঠাৎ একদিন রাত দশটার দিকে হেড কোয়ার্টার থেকে বেতারে খবর এল, কিছু চীনা জওয়ান নাকি সাধারণ পোশাকে নেফার কোন কোন জঙ্গলে তখনো ঘুরে বেড়াচ্ছে; আমাদের খুঁজে দেখতে হবে তারা এদিকে আছে কি না—নেফার সীমানা ছিল আমাদের ছাউনি থেকে কাছেই। সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত হয়ে আমরা ছুটো জোড়ায় রওনা দিলাম বড় রাস্তা ধরে। প্রত্যেক জোড়াতেই রাখা হল রাস্তার ছু-ধারের জঙ্গলের দিকে মুখ-করা ছুটো উচ্চ ক্ষমতার সার্চলাইট। জঙ্গলের ভেতরে ছিল লম্বা লম্বা ঘাস—বুনো হাতি এই ঘাস খায় বলে বোধ হয় এর নাম এলিফ্যাণ্ট-গ্র্যাস। শাল, শিশু, জারুল, মেহগনি, হলং, পানিসাজ, পাকাসাজ, গামার প্রভৃতি বড় বড় গাছের ভেতর দিয়ে জমাট অন্ধকারে ভরা জঙ্গলটাকে মনে হচ্ছিল মূর্তিমান সব দৈত্য-দানোর আড্ডাখানা। । গাছ কেটে নেবার ফলে জঙ্গল কোন কোন জায়গায় বেশ হালকা। প্রথমে আমাদের ছুটো জোড়াই একই রাস্তা ধরে চলতে লাগল। মাইল-খানেক যাবার পর আমাদের গাড়ীটা বাঁ-দিকে মোড় নিয়ে চলতে লাগল একটা কাঁচা রাস্তা ধরে, অন্য গাড়ীটা চলে গেল সোজা আগের রাস্তায়। আমি রাইফেল উঁচিয়ে বসে আছি ড্রাইভারের পাশে; পেছনের খোপে জঙ্গলের দিকে রাইফেল তাগ করে দাঁড়িয়ে আছে ছুজন হাবিলদার আর একজন সুবেদার মেজর। গাড়ী চলছে ঘণ্টায়

পাঁচ-মাইল কি তারও কম বেগে, যাতে ছু' ধারের জঙ্গলই বেশ ভালভাবে লক্ষ্য করতে পারা যায়। এই দিকটায় জঙ্গল বেশি ঘন। বড় গাছের মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে আছে পিপল, ময়না, শিমুল, পিঠেলি, খয়ের, হরিতকি, বহেরা, চালতে, চিলৌনি—কোনটার ফল ওষুধ, কোনটার ফল বিষ! আসামের জঙ্গলে যে আরো কত রকমারি গাছ আছে তার হিসেব দেওয়া মুশকিল। ছু'পাশের জঙ্গলের বড় বড় গাছের ডালপালা এগিয়ে এসে মাথার ওপরের আকাশটা এক রকম ঢেকে রেখেছিল। আকাশে চাঁদ থাকলেও বনের ভেতরটা ছিল বেশ অন্ধকার। জোঙার হুড খোলা। আমার পেছন থেকে মাঝে-মাঝে হাবিলদাররা মাথার ওপরের দিকেও টর্চ ফেলে দেখছিল কোন ছুশমন গাছে উঠে বসে আছে কি না। এখন-তখন ছু-একটা বন মোরগ টর্চের আলোর মধ্যে পড়ে গিয়ে ডানা ঝটপটিয়ে ডালপালার আড়ালের অন্ধকারে সরে যেতে চেষ্টা করছিল। বানরগুলো নিজেদের জায়গায় বসে থেকেই নীচের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করছিল আমরা শেষ পর্যন্ত কি করি।

এই রাস্তা দিয়ে প্রায় আধ ঘণ্টা চলার পর আমরা একটা ইংরেজী এস-এর মত বাঁকের মাথার কাছে পৌঁছোলাম। এখানে রাস্তার ধারে একটা বড় নোটিশ বোর্ড দেখতে পেলাম ; তাতে লেখা ছিল, "BOG, CAUTION (জলাভূমি, সাবধান) !"—বোধ হয় বনবিভাগ থেকেই টাঙিয়ে রেখেছিল সেটা। এস-এর মাথার ঠিক বাঁ-দিকে ছিল আট-ন'ফুট উঁচু একটা ঝোপ। আমরা তখন ঝোপটার দশ-পনর ফুটের মধ্যে এসে পড়েছি। হঠাৎ দেখি ঝোপের পেছনের দিকে একটু উঁচুতে জ্বল-জ্বল করছে বেশ বড় বড় ছুটো চোখ, আর তার ছু' পাশে ছুটো শিং। আমি গুলি করতে যাচ্ছিলাম, পেছন থেকে সুবেদার শিউশঙ্কর আমার জামা টেনে সাবধান করে দিল, যাতে আমি গুলি না করি। তখন যে আমার মাথায় কি খেলে গেল, আমি সার্চলাইটের সুইচে হাত দিয়ে এক সেকেণ্ডের জন্য সব

আলো নিভিয়ে দিয়েই তক্ষুণি আবার সেগুলো দপ্ করে জ্বেলে দিলাম। ঝোপটার দিকে আবার তাকিয়ে দেখি প্রাণী বা পিশাচটা সেখানে নেই। আমি ফিসফিসিয়ে বললাম,

"গৌর বোধ হয়।"

স্থবেদারও ফিসফিসিয়ে জবাব দিল, "হাঁথি আছে সাব।"

বললাম, "হাতির কি শিং হয় ?"

স্থবেদার ব্যাখ্যা দেয়, "হাতির কানকেই আধা-অন্ধকারে মনে করেছেন শিং।"

আমাদের গাড়ী আবার এগিয়ে চলল ধীরে ধীরে। গাড়ীর আলোতে লক্ষ্য করলাম রাস্তার ওপরে একটা হাতির পায়ের ছাপ, আর তার পাশেই রয়েছে গরুর ক্ষুরের মত বিরাট আকারের আর একটা পায়ের দাগ। আজও আমার মনে প্রশ্ন রয়েছে, সেদিন আসামের জঙ্গলে যে বিরাট জন্তুটা রাতের অন্ধকারে দেখেছিলাম, সেটা আসলে কি ছিল।

এগিয়ে যেতে যেতে হাতির গায়ের উৎকট গন্ধ পাচ্ছিলাম ; বেশ বুঝতে পারছিলাম দুপাশের জঙ্গলে কাছাকাছি হাতির পাল রয়েছে। চুপি চুপি স্থবেদারকে জিজ্ঞেস করলাম পিছিয়ে যাব কি না। স্থবেদারের জঙ্গলের অভিজ্ঞতা অনেক দিনের। বলল, "ভয় পাবেন না। ভয় পেলে ওরা বুঝতে পারে, তখন পেয়ে বসে। আপনি যদি ওদের অগ্রাহ্য করে চলে যান, ওরাও আপনাকে আমল না দিয়ে নিজেদের খেয়ালে মেতে থাকবে।"

হাতির পাল ছাড়িয়ে কিছুদূর যেতে দেখা গেল রাস্তাটা দুদিকে চলে গেছে। আমাদের যাবার কোন নির্দিষ্ট দিক ছিল না। জঙ্গলে শত্রু সৈন্য খোঁজাখুঁজি করে দেখাটাই ছিল আসল উদ্দেশ্য। কাজেই আমরা তেমন কিছু না ভেবেই প্রথমে চলতে লাগলাম বাঁ-দিকের পথ ধরে। কিন্তু এক'শ গজের মত এগিয়ে যেতেই গাড়ীর আলোর শেষের দিকে পথের ওপর দেখা গেল একটা বিশাল কালো ছায়া।

আর কিছুদূর এগিয়ে বোঝা গেল সেটা ছায়া নয়, জলজ্যান্ত এক-দাঁতওয়ালা একটা বিরাট গণেশ-হাতির কায়া—পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে, আর ধীরে ধীরে এপাশে-ওপাশে দুলছে। বাধ্য হয়ে গাড়ী পিছিয়ে নিয়ে রাস্তা ভাগের জায়গায় পৌঁছে আবার ডান দিকের পথ ধরে এগুতে থাকি। কিন্তু ঠিক আগের মত কয়েক'শ গজ যেতেই দেখি হাতিটা আমাদের মতলব বুঝতে পেরে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সর্টকাট করে আবার এই পথের ওপর চলে এসে আগের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুলছে—অনেক সময় ছোট বাচ্চারা যেমন ছু'হাত ছড়িয়ে আমাদের পথ আগলায়, ঠিক সেই রকম যেন। যদি আমাদের হাতির হাসি বোঝার ক্ষমতা থাকত, তাহলে হয়ত দেখতে পেতাম সে তখন মুচকে মুচকে হাসছে। তার বুদ্ধি আর রসিকতার মাত্রা লক্ষ্য করে আশ্চর্য হলাম।

আবার পিছু হটতে হল। ঠিক হল গাড়ী আরো পিছিয়ে নিয়ে জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে নদীর চড়ায় নামা হবে; চড়ার ওপর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে আবার রাস্তায় ওঠার চেষ্টা করতে হবে। যখন নদীর চড়ায় গিয়ে নামলাম, তখন চাঁদের আলোয় বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল চার দিক। গাড়ী এদিকটাতেও চালাতে হচ্ছিল ধীরে ধীরে। হঠাৎ দেখা গেল প্রায় একশ' হাত দূরে একটা ভারী জন্তু বিদ্যুৎ-গতিতে বাতাসে একটা চওড়া হলুদ-পটি টেনে দিয়ে চড়া থেকে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আমার পেছনের সকলে এক সঙ্গে বলে উঠল, "শের, শের হ্যায়!"

কিন্তু চড়া দিয়েও আর বেশিদূর এগিয়ে যেতে পারলাম না। নদীর ধারের জঙ্গলে মটমট করে ডাল ভাঙ্গার শব্দে বুঝতে পারলাম গণেশটা তখনো আমাদের ওপরে নজর রেখেছে। আমাদের পক্ষে সে-রাতে আর এগোনো সম্ভবই হল না।

পরদিন ভোরে তাঁবুতে বসে চা খাচ্ছিলাম, গেট থেকে একজন সেপাই একটি স্থানীয় খোঁড়া লোককে আমার কাছে নিয়ে এল।

লোকটা তার ভাষায় যা বলল তার অর্থ হচ্ছে—আমরা আগের দিন নদীর চড়া দিয়ে যতদূর গিয়েছিলাম, তার থেকে আরো কিছুটা দূরে জঙ্গলের মধ্যে গাছের উঁচুতে ছিল একটা কাঠের-ঘর। সেই ঘরে থেকে সে বন পাহারা দিত। ভোরের দিকে গণেশটা ডাল ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে যখন তার গাছের কাছাকাছি এসে পড়ে, তখন সে গাছে গাছে পালিয়ে আসতে গিয়ে এক জায়গায় পড়ে যায়, তাতেই তার একটা পা ভেঙ্গে গিয়েছে। মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম; আমাদের পূর্বপুরুষের ভাগ্য ভাল যে, আগের রাতে হাতিটা একবারও তেড়ে আসেনি আমাদের দিকে। আমাদের ক্যাম্প-হাসপাতালেই লোকটার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিয়ে, বন-বিভাগের রেঞ্জারের কাছেও ঘটনা সম্বন্ধে একটা খবর পাঠালাম।

একটু বেলা হতেই আমাদের যে-সব গাড়ী ছিল, সব আবার বেরিয়ে পড়ল শত্রু-সৈন্য খুঁজতে। সমস্তটা দিন কয়েক'শ মাইল এদিকে-সেদিকে ছুটোছুটি করেও কোন দুশমনের দেখা পাওয়া গেল না। সন্ধ্যার দিকে হেড-কোয়ার্টার থেকে আবার বেতারে খবর এল, ভারতীয় এলাকায় আর কোন শত্রু-সৈন্য নেই, সকলেই ফিরে গিয়েছে সীমান্তের ওপারে। এক-দিকে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল বটে, কিন্তু আর এক-দিক থেকে পাওয়া গেল এক ভীষণ দুঃসংবাদ। পাগলা-গণেশটা মালবাহী কোম্পানীর একটা খচ্চর আর তার পরিচারককে খুন করেছে। — জানা গেল, ঐ-দিন বিকেলের দিকে কোম্পানীর কয়েকটা লোক যখন ক্যাম্পের এক ধারে খচ্চরগুলোকে দানা-পানি দিচ্ছিল, হাতিটা সেই-সময় হঠাৎ কোথা থেকে তেড়েফুঁড়ে যমদূতের মতো সেখানে হাজির হয়ে অকারণেই তাদের ওপর আক্রমণ চালায়। একটা লোক একেবারে তার শুঁড়ের নাগালের মধ্যে পড়ে যায়। লোকটা পালাতে গিয়েও পালাতে পারেনি, খচ্চর-বাঁধা একটা দড়িতে পা আটকে মাটিতে পড়ে যায়। হাতিটা তক্ষুণি তাকে শুঁড় দিয়ে টেনে এনে পায়ের তলায় পিষে মেরে ফেলে। মানুষটা মারার পর

হাতিটার মাথায় যেন খুনের নেশা চেপে বসল। কাছেই ছিল খুঁটিতে বাঁধা একটা খচ্চর। মানুষটাকে শুঁড় দিয়ে দূরে ছুড়ে দিয়ে আক্রমণ করল খচ্চরটাকে। সেটাও মারা পড়ল অসহায় ভাবে। কোম্পানীতে রাইফেল ছিল রকম-রকম ; কিন্তু তখনো হাতিটা গুণ্ডা বলে ঘোষিত হয় নি বলে তাকে মারার অধিকার ছিল না কারো। কোম্পানী-কমাণ্ডার সুন্দর সিং, পর-পর কয়েকবার বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করতে হাতিটা পালিয়ে যায় জঙ্গলে। এরপর হাতিটা সেখানে রাত্রির দিকেও হানা দিতে লাগল। গন্ধে-গন্ধে রসদের তাঁবুগুলোর খোঁজও পেয়ে গেল সে। কাঁটা-তারের বেড়া ভেঙ্গে ব্যারাকে ঢুকে তাঁবুর ভেতর থেকে দিব্বি আটার বস্তা, ডালের বস্তা তুলে নিয়ে যেতে লাগল প্রায়-প্রায়ই।

আমাদের ছাউনি থেকে দু'মাইল দূরে, পাহাড়ের গায়ে ছিল জওয়ানদের একটা ফায়ারিং রেঞ্জ—পাহাড়ের ঠিক নীচে ছিল বুক সমান উঁচু সামনা-সামনি দুটো লম্বা পাকা দেওয়াল, তার মাঝে একটা লম্বা-চওড়া পাকাকরা-গর্ত ; গর্তের লম্বার দিকের দুটো ধার ছিল খোলা, আর ঢালুমতো—ভেতরে নামতে হত সেই খোলা পথে। জওয়ানরা গুলিছোড়া অভ্যাস করার সময় সহকারীরা এই পাকার মেঝেতে দাঁড়িয়ে কপিকল দিয়ে নানা রকমের টার্গেট ওঠানো-নামানো করত। রেঞ্জের পেছনের দিকে পাহাড় ; সামনের অনেকটা জায়গা ফাঁকা, জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করা। এই ফায়ারিং-রেঞ্জে প্রায়ই চলত জওয়ানদের রাইফেল অভ্যাস। সাধারণত সব জন্তু আমাদের এই ফায়ারিং-রেঞ্জ থেকে দূরে সরে থাকত। কিন্তু নিতান্তই মাথা খারাপ বলে গণেশটা এক এক দিন রাত্রিতে এসে রেঞ্জের মেঝেতে শুয়ে থাকত। একদিন সকালে কয়েকজন মিলিটারির লোক রেঞ্জের মধ্যে কাজ করতে নেমেই হঠাৎ পড়ে যায় পাগলাটার খপ্পরে। গুণ্ডাটা একজন লোককে পা দিয়ে মাড়িয়ে, আর একজনকে শুঁড়ে পেঁচিয়ে আছড়ে ফেলে দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায় জঙ্গলে। একজন

সেখানেই মারা যায়, আর একজন মারা যায় ক্যাম্প-হাসপাতালে। নদীতে জল আনতে গিয়ে কিংবা খচ্চরগুলোকে নাওয়াতে-ধোয়াতে গিয়েও হাতিটার আক্রমণে ঘায়েল হল আরো ক'জন মিলিটারির লোক। জঙ্গলের ভিতরের পথ ধরে পায়ে হেঁটে যে সব পথিক নেফার দিকে যেত, তারাও এক এক সময় পড়ে যেত দৈত্যটার খপ্পরে। কমাণ্ডারের ইচ্ছা গুণ্ডাটাকে আর অনিষ্ট করার কিছুমাত্র সুযোগ না দিয়ে তাড়াতাড়ি খতম করা। কিছুদিন আগে একবার গুণ্ডাটার অত্যাচারের বিষয় বনবিভাগের কর্তাদের জানানো হয়েছিল; কিন্তু সেটাকে নিকেশ করার নির্দেশ পাওয়া যায় নি তখনো। আবার সবদিকে জরুরী খবর পাঠান হল। বনের পশু হত্যা নিষিদ্ধ করে সেনা বিভাগের প্রতি কড়া নির্দেশ ছিল সরকারের। পোচিং করে বনের একটা হরিণ মেরে হজম করা যায়, কিন্তু তাই বলে পাহাড়ের মতো একটা হাতি মেরে তো আর গোপন করা সম্ভব নয়। সেনা-বিভাগে কাজ করলে সবরকম নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলতেই হয়। কাজেই পাগলা হাতিটার অত্যাচার সহ্য করে যেতে হচ্ছিল যত দিন না সেটাকে খতম করার হুকুম আসে। এদিকে রাত্রিতে আগুন জ্বেলে, বন্দুকের শব্দ করে গুণ্ডাটাকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা চলল।

অবশেষে প্রথমবার খবর পাঠাবার মাসখানেক বাদে ঘোষিত হল হাতিটি গুণ্ডা ; এবার তাকে খতম করা যেতে পারে। আমাদের ছাউনি থেকে হাতিটা মারতে চেয়েছিলাম, কিন্তু কমাণ্ডার সিং রাজী হলেন না। তাঁর কথা, হাতিটা মারার অধিকার তাঁরই বেশি, কারণ সেটা সব থেকে বেশি ক্ষতি করেছে তাঁরই ক্যাম্পে। এবার কমাণ্ডারের মাথাতেও খুন চেপে গেল। তাঁর সব থেকে জোরাল রাইফেল, দোনলা ·৫০০ এক্সপ্রেস, বাগিয়ে ধরে গুণ্ডাটার পেছনে ধাওয়া করতে লাগলেন। অবস্থা বুঝতে পেরেই যেন সে এবার জঙ্গলের ভেতরে গিয়ে লুকাল। কমাণ্ডারও নাছোড়। নাওয়া-খাওয়া ভুলে হাতিটার

পিছে-পিছে ছুটতে লাগলেন—কখনো জিপে, কখনো ঘোড়ায় চেপে। এখন আর হাতিটা লোকালয়ের দিকে আসত না মোটেই। মাঝে-মাঝে গভীর বনে শোনা যেত তার চিৎকার, কিন্তু তাকে বাগে পাওয়া যেত না কখনো। একদিন কমাণ্ডার সিং কোম্পানীর দুজন হাবিলদারকে সঙ্গে নিয়ে জিপে করে ধীরে ধীরে বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁর ছাউনি থেকে পাঁচ-সাত মাইল দূরে এক-সময় শুনতে পেলেন গাছের ডাল ভাঙ্গার মটমট শব্দ। জিপ থেকে নেমে কমাণ্ডার সিংয়ের দলটা রাইফেল উঁচিয়ে লম্বা-লম্বা ঘাস আর কাঁটা ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে খুব আস্তে-আস্তে এগিয়ে চলল শব্দ লক্ষ্য করে। কমাণ্ডার মনে-মনে বলেন, "আজ তোমার একদিন কি আমার একদিন!" বনের ভেতরটা ছিল অন্ধকার। এক-এক সময় কমাণ্ডার কোন ঝোপকেই মনে করছিলেন হাতি, আর কালো-ছালের কোন গাছের গুঁড়িকে মনে করছিলেন বুঝি হাতির পা। এক-এক সময় গুলি চালাবার জন্য রাইফেল বাগিয়ে ধরছিলেন কমাণ্ডার, পরক্ষণেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে আবার এগুতে থাকেন ধীরে ধীরে। কখন যে যমটার একেবারে সামনা-সামনি পড়ে যাবেন তার ঠিক নেই। কমাণ্ডারের চোখও তখন জ্বলছে প্রতিহিংসার আগুনে। এইভাবে মিনিট-পনর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলার পর প্রায় একশ-হাত দূরে গাছের ফাঁকে-ফাঁকে অস্পষ্ট দেখতে পেলেন তাদের দিকে পেছন দিয়ে হাতিটা ডাল-পাতা খাচ্ছে। কায়দা-মতো গুলি করার জন্য তাঁরা ঝোপঝাড়ের আড়ালে-আড়ালে তার সামনের দিকে যেতে চেষ্টা করলেন। ঠিক তখনই গণেশটা নিজের মনেই একটা ডাল চিবুতে চিবুতে আর একটা পাতাসুদ্ধ ডাল শুঁড়ে ধরে শরীরের এদিকে-সেদিকে পেটাতে পেটাতে এগুতে লাগল তার সামনের দিকে। হাতিটা কি করে দেখার জন্য কমাণ্ডার তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন যেখানে ছিলেন সেখানেই। হাতিটা যখন আরো কিছুদূর এগিয়ে গেল, তখন কমাণ্ডারও আবার চলতে লাগলেন হাতিটার

পিছে-পিছে। হাতিটা আর কোথাও থামল না। আগে-আগে হাতি, আর তার পিছে-পিছে কমাণ্ডার ; এই-ভাবে চার-পাঁচ'শ গজ চলার পর দেখা গেল বনটা হালকা হয়ে এসেছে। গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা গেল কমাণ্ডারদের ক্যাম্পের কাছের সেই-নদীটাই ঘুরে-ফিরে একটু চওড়া হয়ে বয়ে যাচ্ছে সেখান দিয়ে। হাতিটা নদীর জলের দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে একবার আওয়াজ করে উঠল ক্রিঁ-য়্যাঁ-য়াং। কে জানে সেই চিৎকারের অর্থ কি! পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল তার সমস্ত শরীরটা। কমাণ্ডারের চোখে গণেশটাকে তখন সত্যি পার্বতী-নন্দন দিব্যকান্তি মহাকায় গণেশের মতই সুন্দর মনে হচ্ছিল বুঝি। সিংয়ের মনটা কেমন যেন নরম হয়ে পড়ল। নদীর ভাটির দিকে কিছুটা সরে গিয়ে হাতিটার কান বা ফুসফুস তাগ করে একটা হার্ডনোজ-বুলেট কশে দেবার সুযোগ থাকলেও, কমাণ্ডার সেদিন আর হাতিটাকে গুলি করতে পারলেন না। হাতিটা ধীরে-ধীরে নেমে গেল নদীর ডুব-জলে। শুধু শুঁড়টা জলের উঁচুতে রেখে বাকি সমস্তটা শরীর ডুবিয়ে দিল জলের মধ্যে। কিছুক্ষণ সেইভাবে ডুবে থেকে শরীরটাকে ভাসিয়ে তুলল ওপরে, আর শুঁড় দিয়ে মাথায়-পিঠে ঢালতে থাকল নদীর ঠাণ্ডা জল। হাতি স্নান করতে খুব ভালবাসে। মনের আনন্দে স্নান করতে লাগলেন গণেশ-মহারাজ! কোন দিকে তার যেন কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। নদীর এপারে-ওপারে বন, দূরে পাহাড়ের-পর-পাহাড় যেন সমুদ্রের ঢেউ—নদীতে এক গণেশ-হাতির অবগাহন—সব মিলে প্রকৃতির পটে সৃষ্টি হল এক অপূর্ব দৃশ্য, যেন কল্পলোকের কোন চিত্র-শিল্প! এই অবস্থায় তাকে দেখলে ভাবতে পারা যায় না যে সেটা একটা গুণ্ডা-হাতি, আর সেটাই মাসখানেকের মধ্যে ক'টি মানুষ আর অশ্বতরের জীবন নষ্ট করেছে।

সিংজীর সেদিনের দুর্বলতার জন্য হাতিটা বহাল তবিয়তেই রয়ে গেল। অভিযান সুরু করার পর দু-হপ্তা কেটে গেল, কিন্তু গুণ্ডাটাকে

খতম করা গেল না। অবশ্য তার নতুন কোন কু-কীর্তির খবরও পাওয়া যায় নি এর মধ্যে। ফায়ারিং-রেঞ্জে দুজন লোক মারা যাবার পর থেকেই সেদিকের সমস্ত ইউনিটই হুঁশিয়ার হয়ে যায়। রেঞ্জ ব্যবহার করার আগে ইউনিটের লোকজন প্রথমে খুব সাবধানে দেখে নেয় হাতিটা সেখানে আবার ঢুকে রয়েছে কি-না। আমাদের ইউনিটের রেঞ্জ ব্যবহারের পালা ছিল সেই সময়ের অক্টোবর মাসের প্রথম সাত দিন। অক্টোবরের প্রথম দিন ভোর-ভোর আমাদের সব সাজসরঞ্জাম নিয়ে রেঞ্জ থেকে তিন-চার'শ হাত দূরে গিয়ে দাঁড়ালাম। হাবিলদার মনিরাজ আর নাইক তেজবাহাদুর এগিয়ে গেল রেঞ্জ পরীক্ষা করতে ; তাদের হাতে লোডেড '৩০৩ রাইফেল। কিন্তু অর্ধেক পথ থেকেই তারা নীরবে ফিরে এল। আমাদের কাছে এসে বলল, "গুণ্ডাটা নিশ্চয় রেঞ্জের মধ্যেই আছে—হাতির লাদ পড়ে আছে রেঞ্জের দিকে।" সঙ্গে সঙ্গে সাইকেলে কমাণ্ডার সিংকে খবর পাঠান হল। শয়তানটা আবার রেঞ্জের মধ্যে ঢুকেছে শুনেই কমাণ্ডারের মনে ফের জ্বলে উঠল আগুন। অনেক প্রাণ নিয়েছে গুণ্ডাটা, তাকে আর ছাড়া হবে না। এই রেঞ্জের মধ্যেই শয়তানটা মিলিটারির দুজন অসহায় লোককে খতম করেছিল মাসখানেক আগেই। এবার তাকেও খতম হতে হবে ঐ রক্তমাখা মাটিতে। আট-দশ মিনিটের মধ্যে কমাণ্ডার একটা হেভি-বোরের দোনলা রাইফেল সঙ্গে নিয়ে সাইকেলে নিঃশব্দে পৌঁছে গেলেন আমাদের কাছে। আমাদের দলে ছিল পঞ্চাশ-ষাট জন জওয়ান। আমরা সকলেই আমাদের মিলিটারি-রাইফেলের ম্যাগাজিন ভর্তি করে নিলাম বুলেট দিয়ে, যদি তেড়ে আসে আমরাও তার মোকাবিলা করব। আমরা সকলেই খুব ধীরে-ধীরে আরো কিছুটা এগিয়ে গেলাম। রেঞ্জ থেকে প্রায় একশ হাত দূরে কমাণ্ডার আমাদের ইঙ্গিতে থামিয়ে দিলেন। ইশারায়-বিশারায় বুঝিয়ে দিলেন, প্রথমে তিনি একলাই যাবেন রেঞ্জের ভেতরটা দেখতে, আর সম্ভব হলে তখনই গুলি চালাবেন।

দরকার হলে আর সকলকে হাত তুলে ইঙ্গিত দেবেন। সামনের দেওয়ালের কাছাকাছি পৌঁছোতেই দীর্ঘনিঃশ্বাসের মতো মস্ত একটা ফোঁস শব্দ শুনতে পেলেন কমাণ্ডার। বেশ বুঝতে পারলেন হাতিটা ভেতরেই আছে। উত্তেজনায় কমাণ্ডারের শরীরে তখন রক্তের স্রোত বইছে যেন ঝরণার বেগে। কিন্তু তিনি মিলিটারির লোক, এত অল্পে ঘাবড়াবার পাত্র নন। ট্রিগারে আঙুল রেখেই দেওয়ালের ওপর দিয়ে দেখেন হাতিটা বাঁ-হাতে পাহাড়-ঘ্যাঁষা দেওয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে আছে, তার মাথাটা রয়েছে ভেতরে যাবার একদিকের ঢালুতে ; লম্বা দাঁতটা দেওয়াল ছুঁই-ছুঁই করছে। এরকম সুযোগ আর পাওয়া যাবে না কোনদিন, মনে-মনে ভাবলেন সিংজী। হাতিটা যেভাবে রয়েছে, জেগে উঠলেও হঠাৎ সেখান থেকে তেড়ে আসতে পারবে না। দেওয়ালের ওপরে রাইফেলের নল রেখে, হাতিটার কান তাগ করে লক আলগা করলেন কমাণ্ডার। ঠিক এই সময়, বোধ হয় লক আলগা করার শব্দে কিম্বা নিজের খেয়ালেই, হাতিটা উঠে পড়ার জন্য মাথা তুলল ; কিন্তু জন্তুটা পরের কাজগুলো করার আগেই কমাণ্ডারের একটা স্টিলপ্যাচ-বুলেটের গুলি তার মগজের মধ্যে পৌঁছে গেল। গুলি করেই কমাণ্ডার এক ছুটে পঞ্চাশ হাত দূরে গিয়ে দাঁড়ালেন। এদিকে গুলি খেয়েই হাতিটা একটা কানফাটানো চিৎকার দিয়ে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে রেঞ্জের বাইরে এসে লক্ষ্য করতে চেষ্টা করল কে তাকে গুলি করেছে। সিংজীই ছিলেন তার সব থেকে কাছে দাঁড়িয়ে। তাঁকে দেখতে পেয়েই শুঁড়টা কোন রকমে মাথার ওপরে টেনে তুলে টলতে-টলতে এগোতে লাগল তাঁর দিকে। রাইফেলের নলটা হাতির দিকে উচিয়ে রেখে সিংজীও ধীরে ধীরে পিছু হটছিলেন।—সেদিনের সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য আজও যেন চোখের সামনে ভাসছে। পাহাড় আর বনে-ঘেরা একটা পাথুরে মাঠ। তার মাঝে দাঁড়িয়ে রাইফেল হাতে এক সুশিক্ষিত সৈনিক, আর তার কয়েক হাতের মধ্যে মুখোমুখি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত

বনের এক অসহায় বৃহৎ জন্তু। এ-যেন সেই দেড়-হু'হাজার বছর আগেকার নেরো, টাইটাস, ক্লডিয়াস প্রভৃতি আধ-পাগলা রোম সম্রাটদের আমলের কলোসিয়াম অ্যাম্‌ফিথিয়েটার—হাতিটা অ্যারে-নার মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত একটি কাফরী ক্রীতদাস, আর রাইফেলধারী সিংজী এক সদ্য ধরে আনা ক্ষুধার্ত হিংস্র আফ্রিকার সিংহ; আমরা যেন সেই অ্যাম্‌ফিথিয়েটারের রক্তপাগল দর্শকের দল!

হাতিটার চলার ভঙ্গি দেখেই মনে হচ্ছিল আর গুলির দরকার হবে না—মারটা মোক্ষম হয়েছে। গণেশটা বুঝি শুঁড় তুলে শেষ প্রণাম জানাতেই এগিয়ে আসছিল সিংজীর দিকে। তাঁর কাছেই সে ছিল সব থেকে বেশি অপরাধী। টলতে টলতে আরো পাঁচ-সাত হাত এগিয়ে এসে হাতিটা কাত হয়ে ধপাস করে পড়ে গেল মাটিতে। এক গুলিতেই কাজ হবে কেউ ভাবতে পারে নি। যে অতগুলো খুন করতে পারে, তার জীবনীশক্তি হবে না জানি কত বেশি। হাতিটা যেন ইচ্ছে করেই রেঞ্জের মধ্যে ঢুকেছিল, তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে বলে। শেষ পর্যন্ত প্রাণটাও দিল ঠিক লোকের হাতেই। এ যেন তার আত্মহত্যা!

হাতিটা আর উঠবে না বুঝতে পেরে আমরা এগিয়ে গেলাম। কাছে গিয়ে হাতিটাকে দেখে সকলেই মুখ দিয়ে চ্চু-চ্চু শব্দ করে উঠল। হাতিটার মাথায়, গলায় আর পেটে ছিল কতকগুলো শুকনো ক্ষতচিহ্ন। সকলেই বুঝতে পারে সেটা ছিল কোন হাতির পালের এক হবু দলপতি। পালের আসল-কত্তা একে সহ্য করতে না পেরে এর সঙ্গে এক হাত ডুয়েল লড়ে। প্রচণ্ড একটা লড়াই দিয়েও কিন্তু একে দল থেকে বেরিয়ে আসতে হয়। সেই-যুদ্ধেই খোয়া যায় এর বাঁ-দিকের দাঁতটা। এই ডুয়েলটাই যদি আর কিছু দিন পরে হত, তখন সম্ভবত এরই হত জয়। যুদ্ধে পরাজয় আর উদ্দেশ্যহীন-জীবনের ক্ষোভই এই তরুণ-হাতিটাকে করে তুলেছিল মহা-উচ্ছৃঙ্খল।

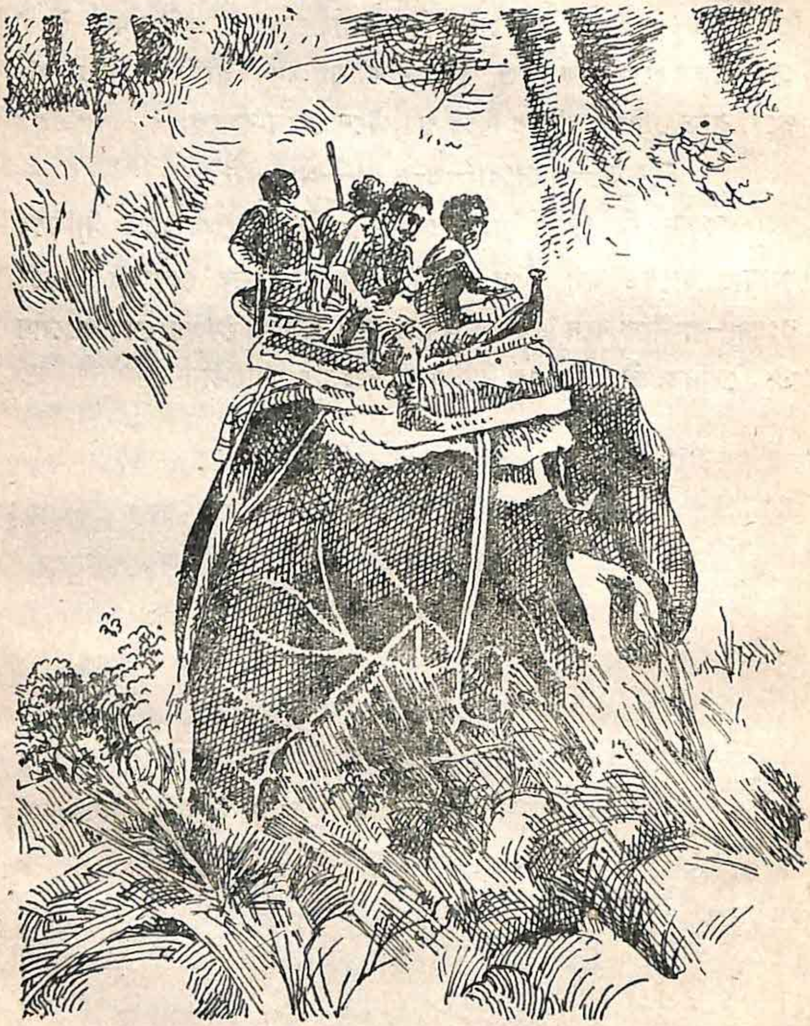
হতভাগ্য স্তব্ধ তরুণ গণেশের ধূসর দেহটার দিকে তাকিয়ে

থাকতে-থাকতে আমার চোখের সামনের সব-কিছু হয়ে উঠল ধূসর। ক্রমশঃ ধূসর-রঙটা যেন ঘন হতে-হতে রাতের অন্ধকারের রূপ নিল; আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল বনের মাঝের একটা আলো-আঁধারি পথ, যেমনটি দেখেছিলাম এক রাতে চীনা শত্রু খুঁজতে বেরিয়ে। সেই-পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে কালো কষ্টিপাথরে তৈরী চার-পাঁচ বছরের এক শিশু, তার মুখে মৃদু মধুর হাসি। কচি কচি দুটো হাত দুদিকে ছড়িয়ে দিয়ে সুর টেনে টেনে বলছে—

"যেতে—এ দেবো—ও-ও না—আ—আ"।

একজন মিলিটারি মেজর হলেও সেদিন রেঞ্জের মাঠে দাঁড়িয়ে আমার চোখেও জল এসে গেল।—শিলংপাহাড়ের কোলের একটা বাংলো-বাড়ীতে বসে একজন অবসরপ্রাপ্ত বাঙালী মেজর শেষ করলেন তাঁর সৈনিক জীবনের এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী।

নয়া বাঘের সদর সফর



রাজরাজড়ার আমলে কুচবিহারের মত একটি সাজান সুন্দর শহর বাংলাদেশে তো আর ছিলই না, সমস্ত ভারতবর্ষেও ছিল খুব কম।

রাস্তাগুলো সব ছেদ করেছে সমকোণে। রাস্তার ধারে-ধারে কোথাও জামগাছ, কোথাও পামগাছ। শহরের সর্বত্র ছিল পরিষ্কার দীঘির সমারোহ। দীঘির আশেপাশে সাদা আর লাল রঙের সরকারী-ভবন, ঠাকুর মন্দির, ধনীদের বাড়ী বাগান, এই সব। পথঘাট ছিল যেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, বাড়ী ঘরগুলিও ছিল তেমনি ঝকঝকে-তকতকে। কিন্তু আজ সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই।

মাত্র চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগেও এরকম একটা আধুনিক শহরে সামান্য একটু রাত হলেই যে-যার ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়বে, আর তার কিছু পরেই ডাকতে থাকবে ফেউ, ভাবতে পারা যায় কি! শুধু ফেউ ডাকলে নিশ্চয়ই আপত্তি করত না কেউ। মুশকিল হচ্ছে ভাগ্নে একলা থাকত না কখনো। যেখানে মামা, সেখানেই ভাগ্নে, আর যেখানে ভাগ্নে সেখানেই মামা—ফেউকে নাকি লোকে বাঘের ভাগ্নে বলে। একবার শীতকালে দেখা গেল একটু রাত হলেই মামা-ভাগ্নে চলে আসে কুচবিহারের সদর সফরে।—শোনা যায় আফ্রিকার কোন কোন অঞ্চলে নাকি রাত দশটার পর শহরগুলো ছেড়ে দেওয়া হয় হায়েনাদের হাতে। জন্তুগুলো শহরের অলি-গলি দিয়ে অবাধে ঘুরে বেড়ায়, আর যেখানে যত হাড়গোড় পড়ে থাকে, সব চেটেপুটে খেয়ে পরিষ্কার করে দিয়ে ভোর হবার আগেই জঙ্গলে গা ঢাকা দেয়। সেদিকে হায়েনাদের বলে শহরের ধাঙড়; সেদিকে নাকি হায়েনা মারা নিষেধ! তবে কুচবিহার শহরটা যে এভাবে মামা-ভাগ্নেদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হত না, একথা জোর দিয়েই বলা যায়। তবু তারা লোকের গোয়ালগুলো পরিষ্কার করতে থাকে ইচ্ছা মত। আজ বোসেদের ভেড়া, কাল পালেদের গরু, এমনি সব পোষা প্রাণী তুলে নিয়ে গিয়ে লোকের গোয়াল খালি করতে থাকে কয়েক রাত ধরে। শিকার নিয়ে জন্তুটা কোথায় গিয়ে লুকাত, দিনের বেলায় অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার কিনারা করা যেত না। অবশ্য কুচবিহার শহরের ঠিক ধারেই কোন বড় বন না থাকলেও সে সময়ে দিনে-রাতে বাঘ লুকিয়ে থাকার মত

অনেক বন-জঙ্গল ছিল শহরের আশেপাশে, বিশেষ করে শহরের উত্তর দিকে। জন্তুটাকে তখন পর্যন্ত কেউ দেখতে না পেলেও, সেটা যে একটা বড়সড় বাঘ ছিল, তা পিচরাস্তার ধারের ধূলোর ওপরে তার শ্রীচরণের ছাপ থেকেই বেশ বোঝা যাচ্ছিল।

একবার এক শীতের রাতে, দশটা সাড়ে-দশটায় রাজেন্দ্ররোডের এক চৌমাথার কাছে কয়েকবার ফেউয়ের ডাক শোনা গেল। শীত-কাল বলে অনেকের বাড়ীতেই তখন গভীর রাত। কিন্তু তবু ফেউয়ের ডাকে অশেপাশের বাড়ীগুলোর অনেকের ঘুম ভেঙ্গে যায়। এই চৌমাথার এক ধারে ছিল একটা উঠে যাওয়া মোটর কোম্পানীর কয়েকটা ভাঙা বাস; তার কাছাকাছি ছিল কানাইদের ভেড়ার খোঁয়াড়, বিহারী মেছোদের আস্তানা, পাড়ার ছেলেদের ব্যায়ামের আখড়া, আর এই সবের একটু উত্তরেই ছিল পাশাপাশি ভৌমিকদের বাগানবাড়ী, আর পোদ্দারদের দীঘি। ভৌমিকদের বাড়ীর ছেলে-মেয়েরাও শুনল ফেউয়ের ডাক, আর তার একটু পরেই আবার শুনতে পেল কানাইদের বাড়ীর দিকে ঘোড়দৌড়ের ধরনের প্রচণ্ড একটা হুটোপুটির শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে সুরু হয়ে গেল চিৎকার চেঁচামেচি হৈ-চৈ। কানাইদের খোঁয়াড়ে থাকত ত্রিশ-চল্লিশটা ভেড়া। কানাইরা বেরিয়ে এসে দেখে অনেকগুলো ভেড়া খোঁয়াড়ের বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। একটা হেরিকেন হাতে খোঁজাখুঁজি করে যতগুলি পেল, আবার ঢুকিয়ে দিল খোঁয়াড়ে। ভোর হতে দেখা গেল একটা ভেড়ার বাচ্চা রাস্তার ওপরে, আর একটা বাচ্চা ভেড়া একজনের বাড়ীর ধারে মরে পড়ে আছে। একটা বড় ভেড়া একেবারে নিপাত্তা। বামাল সমেত জন্তুটা যে কোথায় লুকাল, অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার হদিস মিলল না।

এই ঘটনার পরদিন জন্তুটার মহড়া নিতে শহরের এক নামকরা শিকারী, দিগেন মিত্র, আর আখড়ার ছেলেরা সন্ধ্যার পর থেকেই ওঁত পাতল। সকলেরই ধারণা খোঁয়াড়ে হানা দিতে আবার আসবে

বাঘটা। যে ঘরটায় ভেড়াগুলো থাকত, সেটা ছিল চাটাইয়ের বেড়ার একটা টিনের দোচালা। এই ঘরটার ভেতরে চালার দিকে তক্তা পেতে তৈরী করা হল একটা মাচা। দিগেনবাবু, বারো বোরের একটা দোনলা বন্দুক, কিছু এল-জি কার্তুজ, একটা জোরালো টর্চ, আর একটা ফ্লাস্কে কয়েক কাপ চা নিয়ে সন্ধ্যার কিছু পরেই মাচায় উঠলেন। শিকারীর সহকারী হিসাবে ভৌমিক বাড়ীর নন্তও উঠল মাচায়। নন্ত একবার হাতির পিঠে টাকুয়ামারীর জঙ্গলে গিয়েছিল একটা শিকার পার্টির সঙ্গে। আখড়ার ছেলেরা কয়েকটা দলে ভাগ হয়ে গিয়ে পাড়ার বিভিন্ন জায়গায় কয়েকটা ঘরে ঘাঁটি তৈরী করল। প্রত্যেক দলের হাতে রইল কয়েকটা মুগুর, রাম-দা, সড়কি, আর জোরালো টর্চ। বাঘ মারতে এই সব অস্ত্র যে কিভাবে কাজে লাগবে, সে কথা ভেবে দেখল না কেউ—তাদের উৎসাহটাই ছিল বড় কথা। কানাইরা সকলে সজাগ হয়ে থাকল অন্দরমহলের ঘরের ভেতরে। মেছোদের ঘরে তখন রান্না বসেছে। তাদের ঘরের বাইরে খোলা জায়গায় একটা বড় আগুন তৈরী করে আগুন পোহাচ্ছিল দলের কয়েকজন মেছো। কিন্তু সেদিন কেন যেন রাত দশটা বেজে গেলেও আর ফেউয়ের ডাক শোনা গেল না। রক্ষীদলগুলোর প্রায় সকলেই অধৈর্য হয়ে উঠছিল। এমন সময় চৌমাথার কাছের একটা ঘর থেকে হঠাৎ চিৎকার ওঠে, "ঐ যে, ঐ যে বাঘ! কানাইদার ঘরের দিকে যাচ্ছে!"

ভেড়ার খোঁয়াড়ের মাচানে শিকারী সতর্ক হলেন—বন্দুকের লক খুলে আলগাভাবে আঙুল রাখলেন ট্রিগারে। ঠিক তখনই খোঁয়াড়ে ঘটল এক ফেসাদ—চৌমাথার চিৎকার শুনেই হোক, আর মাচাটার ধারের একটা ফাঁকের কথা ভুলে যাবার জন্যই হোক, নন্ত তার পাশের ফাঁকটার মধ্য দিয়ে একেবারে নীচে। নীচে ছিল কতকগুলো খালি বস্তা, কিছু ঘাস, আমপাতা, আর কাঁটাল পাতা। ঝুপ করে নন্ত গিয়ে পড়ল তার মধ্যে, আর পড়েই অজ্ঞান!

জানোয়ারটা তার আস্তানা থেকে বেরিয়ে কোথা দিয়ে কিভাবে যে সেখানে হাজির হল বলা মুশকিল। কিন্তু যেই সে গুড়ি মেরে কানাইয়ের খোঁয়াড়ের দিকে এগুচ্ছিল, অন্ধকার হলেও তার কালো প্রেতের মত আবছা চেহারাটা পড়ে যায় চৌ-মাথার রক্ষীদলের নজরে। আর অমনি শিকারে আনাড়ী তরুণের দল উত্তেজনায় হৈ-হৈ করে ওঠে "ঐ যে, ঐ যে......"।—পেছনে রক্ষীদের চিৎকার, আর সামনে খোঁয়াড়ে ঝুপ-শব্দ শুনে জানোয়ারটা ভড়কে গিয়ে খোঁয়াড়ের ধার দিয়ে লাগায় ছুট। কিন্তু কয়েক ধাপ এগুতেই সামনে পড়ে যায় মেছোদের তাপানোর আগুন। এক লাফে আগুন আর লোকগুলো ডিঙিয়ে ভৌমিক-বাড়ী আর পোদ্দার-দীঘির মাঝখান দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল দানবটা। আগুনের আলোয় মেছোরাই প্রথম দেখল জানোয়ারটা একটা ভারিসারি স্ট্রাইপার।

পাড়ায় হৈ-রৈ পড়ে যেতে ভৌমিক-বাড়ীর লোকেরা ততক্ষণে যে যার বিছানায় উঠে বসেছে। বাড়ীর গোয়ালটা তাদের বেশ মজবুতই ছিল বলা যায়, আর তার দরজাটাও ছিল শক্ত করে আঁটা। বাঘটার গায়ের গন্ধে গরুগুলো শব্দ করতে থাকে হেঁ-এ ; হেঁ-এ ; হেঁ-এঃ। বাঘটা পালিয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে গরুগুলো বোধ হয় হেঁ-হেঁ করে হাসছিল, নয়ত বাঘটার গন্ধে ভয় পেয়ে নিজের আসল ডাক ভুলে গিয়ে শব্দ করছিল ঐরকম।

অল্পক্ষণের মধ্যে রক্ষীদল যে-যার ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। বাড়ীর আনাচে-কানাচে চলতে লাগল বাঘের তল্লাশ। কিন্তু কোথায় বাঘ! জানোয়ারটা ততক্ষণে সরে পড়েছে শহরের বাইরে। রক্ষীদলের হৈ-চৈ শুরু হতেই নন্তরও জ্ঞান ফিরে এল ; উঠে বসে হাই তুলতে তুলতে বলল, "বাঘটার গায়ের গন্ধে মাথাটা কেমন ঘুরে গেল ; কিন্তু পড়ে গিয়ে আমার লাগেনি একটুও। একটু জল দিগেনদা"।—বেচারা নন্তকে ফ্লাস্কের কাপে খানিকটা চা ঢেলে দিলেন দিগেনবাবু।

পরদিন সন্ধ্যার পর ঠিক আগের দিনের কায়দায় আবার ঘাঁটিতে বসল সকলে। শিকারী সেদিন আর খোঁয়াড়ের মাচায় উঠলেন না, চৌমাথার ঘাঁটিতে গিয়ে বসলেন ছেলেদের সঙ্গে। আশপাশের লোকদের বলে দেওয়া হল সকলে যেন তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে পড়ে, বাঘ এলে গুলি চলবে। কিন্তু সব ব্যবস্থাই বৃথা হল সেদিন ; সমস্ত রাত জেগে বসে থেকেও সে-পাড়ায় আর বাঘটার সাড়া পাওয়া গেল না। রাত পোহাতেই শোনা গেল আগের রাতে সেখান থেকে মাইল খানেক দূরে তোর্সা নদীর ওপারের এক গাঁয়ে হানা দিয়েছিল জানোয়ারটা। রাতে কুকুরের ডাকাডাকিতে আর দিনের বেলায় এখানে সেখানে তার পায়ের দাগ দেখে তাই মনে হয়েছিল সেদিকের লোকের। কিন্তু বাঘটার কোন অত্যাচারের খবর পাওয়া যায়নি সেদিক থেকে।

বাঘটা বেপরোয়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল শহরের ধারে-কাছেই। কয়েক বছর বাদে-বাদে শীতকালে কুচবিহার শহরে যে বনের জন্তু-জানোয়ার ঢুকে পড়ত, এটা কিছু নতুন কথা নয়। সদর-কোতোয়ালির পনর মাইলের মধ্যেই ছিল স্টেটের রিজার্ভ-ফরেস্ট—একদিকে পাতলা-খাওয়া, আর একদিকে টাকুয়ামারি। হাতি, গণ্ডার, বাঘ, ভালুক, কাকর-চিতল-সম্বর-বারসিঙা প্রভৃতি নানা জাতের হরিণ, গৌর—সব রকম জন্তু-জানোয়ারই ছিল এই দুটো বনে। ইংরেজ আমলে প্রতি বছরই বাংলার লাটসায়েব আসতেন কুচবিহার সফরে, আর সেই সময় সায়েবদের স্যুটিং-ক্যাম্প বসত ঐ সব জঙ্গলে। ক্যাম্পের সঙ্গে থাকত ডাকঘর, ডাইনামো, হাসপাতাল, পুলিস-ফাঁড়ি—রাজা আর সায়েবরা সে সময় জঙ্গলে গড়ে তুলত একটা কৃত্রিম শহর বিশেষ।

এবারকার বাঘটা হয়ত কোন শুয়োর কিংবা হরিণের পিছু-পিছু চলে এসেছিল কোন রিজার্ভ-ফরেস্টের বাইরে। তারপর গ্রামের গরু-ছাগল আর মানুষের তাড়া খেতে-খেতে ঝোপঝাড়ের আড়ালে আড়ালে চলে এসেছিল একেবারে সদরে। মনে হয় বাঘটা কিছুদিন

আগেই তার মায়ের ছোট দল থেকে সরে পড়েছিল আলাদাভাবে চরবে বলে। নিজে শিকার ধরতে পারে, কিন্তু মানুষের রক্তের স্বাদ পায়নি তখনো।

সকলেরই ধারণা দিনের বেলায় বাঘটা শহরের বাইরের কোন জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে। শীতকাল বলে রাত নটা-দশটার মধ্যেই চারদিক নিঝুম হয়ে পড়ে, আর সেই সুযোগে বাঘটা অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ছিঁচকে চোরের মত শুরু করে দেয় চুরিচামারি। বলতেই বলে, 'সাপের লেখা, বাঘের দেখা'—গরু-ছাগল সরাতে সরাতে কোনদিন হয়ত মানুষই শিকার করবে বাগে পেলে—লোম-চামড়াশূন্য এমন মোলায়েম মাংস তো আর হয় না কোন প্রাণীর!

বাঘটার দৌরাত্ম্যের কথা শুনে একদিন এক হাকিম হাতির পিঠে শিকারের সাজসরঞ্জাম নিয়ে ঢুকে পড়লেন শহরের উত্তর দিকের জঙ্গলে। শহরের দেড়-দু'মাইল উত্তর-পূর্বে নীলকুঠি নামে যে জায়গাটা আছে, সেদিকের জঙ্গল ছিল উত্তর দিকের এই জঙ্গলের লাগোয়া। শাল, শিশু, ধোপি জাম, শিমুল, পিঠেলি, ময়না, জিওল, পানিয়াল, লতা-কুল, এই সব গাছ, আর সোনালী লতায় ছাওয়া নানারকম আগাছার ঝোপঝাড়ে ভর্তি প্রায় তিন হাজার বিঘার একটানা জঙ্গল ছিল সেদিকটায়। কিছু কিছু ফাঁকা জায়গা আর লম্বা-লম্বা ঘাসও ছিল বনের এদিকে সেদিকে। মনে হয় জঙ্গলটা রেখেছিল ইচ্ছে করেই, খেয়ালী তোর্সা-নদীর গতিপথ ঠিক করার উদ্দেশ্যে, নয়ত পিলখানার হাতিগুলোর চরাবরার সুবিধার জন্য। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বিরাট এক অজগরের মত এঁকে-বেঁকে বয়ে গিয়েছে বুড়ী-তোর্সা বা আদি-তোর্সা। ঘণ্টাখানেক সবটা জঙ্গল চষে বেড়িয়েও কিন্তু কোন বাঘের দেখা পেলেন না হাকিমবাবু; তবে কয়েক জায়গায় কিছু হাড়গোড় পড়ে আছে দেখে তিনি বুঝতে পারলেন বাঘটা ক'দিন আগেও ছিল সেদিকে। বাঘটার হদিস না পে'য় সেদিন হাকিমসাহেব একটু হতাশ মনেই ফিরে গেলেন শহরে।

পরের আট-দশ দিন শহরের সকলের শান্তিতেই কাটল। গরুগুলো গোয়ালে আর ডাকাডাকি করল না, রাত্রিতে-রাত্রিতে হৈ-রৈও পড়ল না কোন পাড়ায়। এরই মধ্যে একদিন পুণ্ডিবাড়ীহাট থেকে ফিরে এসে এক ছাগল-ভেড়ার ব্যাপারী খবর দিল ঐদিকের একজন চাষী সেইদিনের দুপুরে বাঘটাকে ঝোপঝাড়ের মধ্যে একটা নালাতে জল খেতে দেখেছে। বাঘটা কত বড় ছিল ঠিক বুঝতে পারেনি, ঝোপের ধার দিয়ে শুধু তার মাথাটা দেখতে পেয়েছিল সে। চাষীটি ঐ সময় মাঠে যাচ্ছিল তার ধান খেত দেখতে ; বাঘটা দেখতে পেয়েই ছুটে পালিয়ে আসে গ্রামে। লোকে মনে করছিল বাঘটা বোধ হয় ইতিমধ্যে তার নিজের বড় জঙ্গলে ফিরে গিয়েছে। কিন্তু এই খবর পেয়ে শহরের লোকেরা, বিশেষ করে উত্তর-শহরতলির গৃহস্থরা, আবার সতর্ক হল। সতর্ক হয়েও কিন্তু বিশেষ লাভ হল না। নিজেদের শোবার ঘরের ব্যবস্থা অনেকটা পাকা হলেও খুব কম লোকেরই পাকা গোয়াল আর তার মজবুত দরজা থাকে। সাধারণ গৃহস্থদের এই দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে একদিন মধ্য রাত্রে বাঘটা উত্তর শহরতলির ফণী বর্মণের গোয়ালের ঝাঁপ ভেঙে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। গোয়ালের মধ্যে ছিল কয়েকটি বলদ আর গাই। বাঘটার গোয়ালের কাছে আসা বুঝতে পেরে গরুগুলো প্রথম থেকেই ঘরের মধ্যে দাপাদাপি করতে থাকে, আর নাকে-মুখে শব্দ করতে থাকে, হুঁ-অঃ হুঁ-অঃ। ওদিকে বাড়ীতে বাঘ ঢুকেছে টের পেয়ে ফণী আর তার ছেলেরা ঘরের মধ্যে টিন পিটিয়ে, দরজা পিটিয়ে, আর মুখে যে যেভাবে পারল শব্দ করতে লাগল। গরুগুলো আগের দিকে দাপাদাপি করলেও, পরের দিকে সব একেবারে চুপ মেরে গেল। গরুগুলোর দাপাদাপি বন্ধ হবার কয়েক মিনিট পরে ঘরের সব জানালা খুলে আর ফাঁক-ফোকর দিয়ে লক্ষ্য করে ফণীরা বুঝতে পারল জানোয়ারটা পালিয়েছে। গোয়ালের দিকটা ভাল দেখা যাচ্ছিল না বলে বুঝতে পারছিল না সেদিকে কি ঘটল। আধ

ঘণ্টার মত ঘরের মধ্যে অপেক্ষা করে, ফণী আর তার এক জোয়ান ছেলে, একজন একটা লণ্ঠন আর একজন একটা বল্লম হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। গোয়ালের কাছে পৌঁছে দেখে তার দুধেল-গাইটাই ঘাড়-মটকান অবস্থায় মরে পড়ে আছে গোয়ালের বাইরে—রক্তের বন্যায় ভেসে যাচ্ছে জায়গাটা। গাইটার অবস্থা দেখেই ফণী একেবারে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। গাইটা ছিল ফণীর খুব আদরের; তখনো দুধ দিত দুবেলায় পাঁচ-সের। বাঘটা চুপি চুপি গোয়ালে ঢুকে গরুটার ঘাড় ভেঙে তাকে বাইরে নিয়ে এসেছিল ঠিকই, কিন্তু হঠাৎ কাছের একটা ঘরে নানা উদ্ভট শব্দ হতে ঘাবড়ে গিয়ে সেটাকে সেখানেই ফেলে রেখে চোরের মত নিঃশব্দে চম্পট দেয়।

পরদিন ভোর হতে-না-হতেই ঘটনাটা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল সারা শহরে। অনেকেই এল মরা গাইটা দেখতে। লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, বাঘটা নিশ্চয়ই শহরের উত্তর দিকের জঙ্গলেই রয়েছে কোথাও; তার শিকারটা টেনে নিয়ে যাবার আশায় রাত্রির জন্য অপেক্ষা করতে থাকবে সেখানে। নীলকুঠির পিলখানায় তখন হাতি ছিল চল্লিশ-পঞ্চাশটা। বেশ শিক্ষিত। প্রতি বছরই একবার তাদের শিকারে যেতে হত বাংলার লাটবাহাদুরের সঙ্গে। বেলা বারটার দিকে পনর-কুড়িটি হাতি যাট সত্তর গজ দূরে দূরে দাঁড়িয়ে নীলকুঠির দিকের জঙ্গলটা ঘিরে ফেলল বাঁকা চাঁদের আকারে। শহরের উত্তর দিকের জঙ্গলে নেমে পড়ল আরো দুটো হাতি—একটিতে ছিলেন দোনলা বন্দুক নিয়ে শিকারী দিগেন মিত্র, আর একটিতে ·৩৭৫ ম্যাগনাম রাইফেল নিয়ে মিলিটারি-ফেরৎ এক নেপালী, রণবাহাদুর থাপা। দিগেনবাবুর সঙ্গে ছিলেন শহরের এক হাকিম সাহেব। জঙ্গলঘেরা সব হাতির পিঠে হাওদা থাকলেও কিন্তু তার সবগুলোতে লোক ছিল না; কেবল মধ্যের আর দুধারের দুটো হাতির পিঠে ছিল রাইফেলধারী কয়েকজন পুলিশের লোক আর কিছু সরকারী

অফিসার। গোটা জঙ্গলটা হয়ে দাঁড়াল যেন মহাভারতের আমলের এক যুদ্ধক্ষেত্র। বাঘ দেখলে কেউ যাতে এলোপাথাড়ি গুলি না চালায় তার জন্য আগে থেকে বিশেষভাবে সাবধান করে দিলেন হাকিমবাবু, কুড়ি-পঁচিশ গজের মধ্যে বাগে না পেলে গুলি করবে না কোন শিকারী। শিকারীরা বলে দিল যেই গুলি চালাক, একটা গুলির শব্দ হলেই সব হাতি থেমে যাবে যে যার জায়গায়, বুঝতে হবে বাঘ নজরে পড়েছে ; আর তিনটে গুলি হলে বুঝতে হবে মাটিতে পড়ে গেছে বাঘ।

নীলকুঠির দিক থেকে সুরু হল হাতির জঙ্গল বিট করার কাজ। প্রত্যেক হাতির গলাতেই ছিল বড় বড় ঘণ্টা বাঁধা। হাতিগুলো ধীরে ধীরে পশ্চিমদিকে এগুতে সুরু করলে তাদের সব ঘণ্টা এক সঙ্গে বাজতে লাগল টিং-ডং ডিং-ঢং শব্দে। জঙ্গলের বাইরে তখন হাজার হাজার লোক দাঁড়িয়ে—জানোয়ারটা জঙ্গল থেকে হঠাৎ তেড়ে-ফুঁড়ে বেরিয়ে এলে যে কি হবে, সে খেয়াল ছিল না কারো। নীলকুঠির দিকে জঙ্গল পেটান সুরু হবার পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে উত্তর দিকের হাতির পিঠের শিকারীরা প্রায় এক'শ গজ দূরে দেখতে পেলেন একটা কেঁদো বাঘ ঝোপঝাড়ের আড়ালে আড়ালে ছুটে যাচ্ছে খাড়া পশ্চিম দিকে। হাতি দুটো কাছাকাছিই ছিল। বাঘটা নজরে পড়তেই দিগেন মিত্র একবার বাহাদুরের দিকে তাকিয়ে একটা গুলি ছুঁড়লেন মাটির দিকে, আর অমনি বিটার হাতিগুলো দাঁড়িয়ে গেল যে যার জায়গায়। ওদিকে গুলির শব্দে ভয় পেয়ে বাঘটা দাঁড়িয়ে গেল একটা ঝোপের ভেতরে। দিগেনবাবু আর বাহাদুরের হাতি দুটো তখন এগুতে লাগল বাঘের ঝোপটা ঘিরবে বলে। বাহাদুরের হাতিটা যখন ঝোপটার পঞ্চাশ গজের মধ্যে এসেছে, বাঘটা বিদ্যুৎ-গতিতে ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে এক লাফে নেমে গেল একটা শুকনো খালের ঝোপঝাড়ের ভেতরে। বাহাদুর গুলি চালিয়ে হয়ত বাঘটাকে ঘায়েল করতে পারত, কিন্তু সে তা না করে হাতিটাকে

ঘুরিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি এগুতে লাগল খালের দিকে। দিগেনবাবুর হাতিটা তখন এগিয়ে চলল আর এক দিক থেকে খালে নামবে বলে। বাহাদুরের হাতিটা যখন খালের ঠিক মাথায়, ত্রিশ-চল্লিশ গজ দূরে বাহাদুর আবার দেখতে পেল বাঘটা খানিকটা ফাঁকা জায়গার ভেতর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে সামনের একটা বড় ঝোপের দিকে। বাহাদুর এবার হাকিমের কথা অমান্য করেই বাঘটার দিকে কশে দিল একটা সফটনোজ-বুলেট। গুলিটা বোধ হয় লাগল যমটার ঘাড়ে। একটা প্রচণ্ড গর্জন ছেড়ে জানোয়ারটা ডিগবাজি খেতে খেতে থেমে গেল মাটিতে ; কিন্তু তবু গর্জাতে গর্জাতে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে ঢুকে গেল তার সামনের ঝোপে। বাহাদুরের হাতিটা তখন ধেয়ে গিয়ে নেমে পড়ল খালে। ঝোপের কাছে পৌঁছে বাহাদুর দেখতে পেল বাঘটা মাটিতে পড়ে আছে ; তখনো থেকে থেকে গোঙাচ্ছে সেটা। খুব কাছে হাতির গলার ঘণ্টার আওয়াজ শুনতে পেয়ে সেটা উঠে দাঁড়াতে গেল, কিন্তু আবার পড়ে গেল মাটিতে। বাহাদুরের রাইফেলের ম্যাগাজিনে আগে থেকেই ভরা ছিল পাঁচটা বুলেট ; এবার তার আর একটা খরচ করল বাঘটার কান লক্ষ্য করে। এই গুলিতেই একেবারে নিকেশ হল জানোয়ারটা, আর খতম হল তার সদর সফরের কার্যসূচী।

লোকজন বাঘটাকে টানতে টানতে ঝোপের বাইরে নিয়ে এলে মেপে দেখা গেল সেটা পাকা আট ফুট লম্বা। দিগেনবাবু তার দাঁত, থাবা, আর চেহারা পরীক্ষা করে বললেন, “আড়াই বছর তিন বছর হবে এর বয়স। মনে হচ্ছে কয়েক মাস আগেই এটা তার মায়ের কাছ থেকে সরে এসেছে আলাদা ভাবে চরবে বলে।”

শহরের ভেতরে বাইরে বুনো জন্তু নিধনের এমনি কত ঘটনা যে ছড়িয়ে আছে কুচবিহার রাজ্যের ইতিহাসে, তার হিসেব দেওয়া মুশকিল।

কাতলাপাড়ের আতঙ্ক



ছোটদের শিকারের বইয়ের গল্প পড়লে মনে হয় সবই বুঝি আজগুবি। তবে যারা তেমন তেমন বনে-জঙ্গলে ঘুরেছে, তারা বলে সত্যিকারের এমন অনেক ঘটনা আছে, যা কি না বইয়ের গল্পের

চাইতেও বেশি রোমাঞ্চকর, ঢের আশ্চর্যের। তেমন একটা সত্যিকারের জঙ্গলের গল্প শুনলেও হয়ত মনে হবে সেটা নেহাতই বানানো। বাড়ীর সামনে চিতল হরিণের পাল ঘুরে বেড়ায়—চিতলে চিতলে যুদ্ধ হয়, অজগরে জন্তু গেলে, মানুষ গেলে, এমন সব কথা পরখ করতে হলে ত্রিশ বছর পিছিয়ে শিকারীদের সঙ্গে যেতে হবে কাজলপাতার জঙ্গলে ধনঞ্জয় ডিঙালের চাষবাড়ীতে।

কাঁথি তমলুক মহকুমার অনেক মহাজন যেমন একসময়ে সুন্দর-বনের বাঘ, বরা, হরিণ, আর ভয়াল কেউটে, ময়াল, শঙ্খচূড় ভর্তি জঙ্গল বন্দোবস্ত নিয়েছিল বন কেটে আবাদি জমি তৈরী করবে বলে, কটক জেলার সমুদ্র উপকূলের কাজলপাতার কিছু জঙ্গলও তেমনি বন্দোবস্ত নিয়েছিল এই মহকুমার ধনঞ্জয় ডিঙাল চাষবাসের উদ্দেশ্যে। সুন্দরবনের মতোই কাজলপাতার জঙ্গলেও ছিল সুন্দরী, গরাণ, গামা, বানী, ক্যাওড়া, করঞ্জ, হেঁতাল, লেতুয়াকাঁটা প্রভৃতি কাঠ-অকাঠের গাছ। জংলী-শুয়োর আর হরিণে বনটা ছিল ঠাসা। চিতাবাঘ আর জন্তুগেলা অজগরও ছিল সেখানে মেলাই। জানা-অজানা অনেক শিকারীর আনাগোনা ছিল ডিঙালবাবুর কাজলপাতার বাড়ীতে। তখনকার দিনে তার জঙ্গলবাড়ীতে যেতে হলে অনন্তপুর হাটের কাছে মহানদী পার হয়ে, বনের মধ্য দিয়ে ডিঙিতে খালে-খালে বার-চোদ্দ মাইল যেতে হত পুবে ; আর শেষের মাইল চারেক পা-গাড়ীতে।

প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বে একবার কার্তিকের শেষাশেষি সুনির্মল, শশধর আর অমলেন্দুদের একটা ছোট শিকারীদল গিয়েছিল কাজল-পাতায় শিকারের বিমল আনন্দ উপভোগ করতে। খালের অঢেল ভেটকি, পার্শে, গুর্জালি মাছ, সমুদ্রের চড়ায় হাঁস, শরাল, স্নাইপ, বনের চিতল, বনমোরগ, হরিয়াল—কাজলপাতার জঙ্গল এলাকা ছিল এই শৌখিন শিকারীদের স্বর্গরাজ্য। কাজলপাতায় পৌঁছোবার পর প্রথম কদিন তারা শুধু বনের ভেতরটা ঘুরে-ঘুরে দেখতে লাগল কোথায়

কি আছে।—চারদিকে শুধু নোনামাটির গাছ। জঙ্গলের মধ্যে হঠাৎ কখনো দেখা যায় একটা পুরানো ঝাঁকড়া আমগাছ, নয়ত নারকেল গাছ। কোথাও বা জঙ্গলে ঢাকা মাটির ঢিবি। সেদিকের লোকদের বিশ্বাস এককালে সেদিকটায় বড় বড় গ্রাম ছিল। হার্মাদ দস্যুদের অত্যাচারে বাড়ীঘর ছেড়ে পালিয়ে যায় গ্রামের লোকেরা। ক্রমে ক্রমে সবকিছু ধ্বংস হয়েছে, সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শুধু আগের দিনের গৃহস্থদের দু'একটা কালজয়ী আম নারকেলের মতো মিঠেমাটির গাছ। কালে কালে ঝড়জলে ভেসে-আসা বীজ থেকে সমস্ত এলাকাটা ভরে গেছে নোনাজঙ্গলে। বনের মাঝে মাঝে ছিল ঘাসে ভর্তি দু'চার বিঘা ফাঁকা জায়গা। ওড়িয়া ভাষায় এরকম ফাঁকা জায়গাকে বলে পদা। তাদের আবার এক একটা নামও আছে, যেমন তালপদা, চাঙরাপদা। রাত্রিতে এইসব পদায় চিতলের পাল আসত ঘাস খেতে। পদার এক ধারে গর্ত করে তার ওপর ডালপালা চাপিয়ে, একটা কৃত্রিম ঝোপ মতো তৈরী করে তার ভেতরে বসে হরিণ মারত শিকারীরা। এ-রকম কৃত্রিম ঝোপকে কোথাও কোথাও চাপাটোপ বলে।

সমুদ্রগামী জাহাজকে আলোকসংকেত দেখানোর জন্য একটা লাইটহাউস বা আলোকমঞ্চ ছিল ধনঞ্জয়ের বাড়ী থেকে মাইল খানেকের মধ্যে। লোকে সেটাকে বলত কাজলপাতা লাইটহাউস—কাজলপাতা বনের ধারে ছিল বলে হয়ত তার নামটা ঐরকম। তার এঞ্জিনিয়ার একজন মাদ্রাজী। তার আসল নামটা সেদিকের খুব কম লোকেই জানত; মধুসাহেব নামেই সকলে চিনত তাকে—স্থানীয় ওড়িয়াদের মুখে মুখে মাদ্রাজী শব্দটা হয়ে দাঁড়ায় মধুরসী, আর তাই বোধ হয় মধুসাহেব। লাইটহাউসের আশপাশে ছিল কর্মচারীদের কয়েকটা বাড়ী। তারই একদিকের একটা বাংলো বাড়ীতে থাকত মধুসাহেব, অর্থাৎ মুরলীমোহন পিল্লাই, আর একদিকের একটা ঘরে বাস করত সেখানকার গার্ড, বীরবাহাদুর গুরুং।

বাহাত্তুরের বন্দুকের হাত ছিল দারুণ পাকা। বাহাত্তুর তার বারো বোরের বন্দুক নিয়ে শিকারে বেরোত মাঝে মাঝে। কয়েকদিনের মধ্যে পিল্লাই আর বাহাত্তুরের সঙ্গে শিকারীদলটার জমে উঠল ভীষণ ভাব। কোথায় কি শিকার পাওয়া যাবে, সে বিষয়ে তাদের কাছ থেকে অনেক খবর পেল খোকনরা—খোকন সুনির্মলের আটপৌরে নাম। পিল্লাইয়ের ছিল একটি ·375 হাই ভেলসিটি ম্যাগাজিন রাইফেল। এই রাইফেল দিয়ে সে কেওনঝাড় ও ময়ূরভঞ্জের জঙ্গল থেকে কৃষ্ণসার, সম্বর, বাইসন মেরেছে কয়েকটা—কৃষ্ণসার এক জাতের হরিণ ; তার শিং হয় মোড়ানো মোড়ানো, আর চক্রযুক্ত—বয়স একটু বেশি হলে রঙ দাঁড়ায় কালো। দেখতে ভারী সুন্দর—প্রকৃতির শিল্প বিশেষ। পিল্লাই খোকনদের ভরসা দিল যদি দরকার হয়, তবে তার রাইফেলটা ধার দিতে পারে মাঝে মাঝে।

লাইটহাউসের এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের তিন চার দিন পরে ধনঞ্জয়ের বাড়ী থেকে মাইলখানেক পশ্চিমের একটা পদায় শিকারে বসবে ঠিক করল খোকনরা। জঙ্গলের এই দিকটায় মাঝে মাঝে তালগাছ ছিল বলে এই ফাঁকাটাকেই লোকে বলত তালপদা। তালপদার আশপাশের জঙলাগাছ কেটে এনে এই পদার ধারে ধারে তৈরী করা হল ত্নটো চাপাটোপ, অর্থাৎ কৃত্রিম ঝোপ। যা যা ব্যবস্থা করার ত্নপুরের আগেই সে সব ঠিক করে রাখা হল। ফ্লাস্কে চা নিয়ে সন্ধ্যার একটু আগেই ঝোপের মধ্যে গিয়ে ঢুকল শিকারীরা। হরিণ মারতে বসলেও সেখানে যে হরিণ কিংবা শুয়োরের পিছু পিছু কোন চতুর চিতা পৌঁছে যাবে না, তার কোন নিশ্চয়তা ছিল না। কাজেই বন্দুকগুলির দিক থেকে প্রস্তুত ছিল তারা। একটা ঝুপড়িতে বসল খোকন আর অমলেন্দু, আর একটায় বসল শশধর ; শশধরের সঙ্গে থাকল গোপাল নামে একজন স্থানীয় গাইড। কি শুক্লপক্ষ, কি কৃষ্ণপক্ষ—রাতের আকাশে কিছুক্ষণ চাঁদ থাকেই, কেবল ঠিক অমাবস্যার আগে পরে কয়েকদিন ছাড়া। শিকারের সময়টা ঠিক-

ঠিক বেছে নিতে পারলে মাসের বেশির ভাগ রাতেই শিকারীরা চাঁদের সাহায্য পায়, যদি আকাশ থাকে পরিষ্কার। সাধারণতঃ চাঁদের অবস্থান জেনেই জঙ্গলে নামে শিকারীরা।

রাত ন'টা-দশটায় জঙ্গলের মাথায় দেখা দিল কৃষ্ণাপঞ্চমীর চাঁদ। মধ্যরাত্রির দিকে খোকনরা ম্লান জোছনায় দেখতে পেল তাদের উল্টোদিকের জঙ্গল থেকে চিতলের একটা ছোট দল এল পদায় ঘাস খেতে—প্রথমে ঢুকল একটা, তার পেছন পেছন ছুটো, তাদের আশপাশের গাছের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল আরো চার পাঁচটা। সব থেকে সামনেরটার বুক লক্ষ্য করে খোকন চালাল তার টেনসট ·22 রাইফেল, আর একই সময়ে একটার কপালে শশধর কশে দিল তার বারো বোর সটগান থেকে একটা আড়াই ইঞ্চি এল-জি। ছুটো চিতলই ধড়াস ধড়াস পড়ে গেল মাটিতে, বাকিগুলো নিমেষের মধ্যে হাওয়া। শশধরের চিতলটা ছিল বেশ বড়সড় একটা মদ্দা; তার ছু'দিকের শিং-এ ছিল ছ'টা পুষ্ট ডাল। চিতলহরিণের হালকা পিঙ্গল রঙের দেহের নানা স্থানে থাকে সাদা ফোট ফোট দাগ। অন্য সব জাতের হরিণের তুলনায় চিতল দেখতে সব থেকে সুন্দর। সব অরণ্যের অলঙ্কারবিশেষ এই প্রাণী। ভারত আর শ্রীলঙ্কা ছাড়া পৃথিবীর আর কোন জঙ্গলে দেখা যায় না এদের।

শিকারে গেলে সমস্তটা রাতই প্রায় বনের ভেতরে থাকে শিকারীরা, ভোরের দিকে ফিরে আসে আস্তানায়। চা মুড়ি মাছ ভাজায় প্রথম দফা প্রাতরাশ সেরে গল্পগুজব করে কাটায় কিছুক্ষণ। তারপর উঠে পড়ে স্নানপর্ব শেষ করতে। বনের ভেতরকার খাল আর খাড়িতে জল প্রচুর, কিন্তু নোনা। সে জলে অঢেল মাছ থাকলেও অন্য কাজ বড় হয় না তাতে। পলিমেশা জল বলে তা দিয়ে না স্নান, না রান্না, কোনটাই চলত না। দিনে-রাতে চারবার জোয়ার-ভাটা খেলে বলে সে জল থাকে সব সময় ঘোলা। ভাল জল বলতে যা বোঝায়, অর্থাৎ যা স্নান-পান-রান্নার কাজে লাগে, তা

পাওয়া যেত কেবল চুয়া থেকে। বনের মাটি খুঁড়ে এখানে-সেখানে ছোট ডোবার মতো করা আছে, তার জল মিঠে। এই জলের ডোবাকে ওখানে বলে চুয়া। তারই জলে চলত স্নান-পান-রান্না। তবে হাতে জঙ্গলের দেদার কাঠ থাকায় খাওয়ার জলটা সেখানে ফুটিয়ে নিত তারা। স্নানের পর মাছের টক আর মাছভাজা দিয়ে পেট পুরে ভিজে ভাত খেয়ে কশে ঘুম দিত খোকনরা। নোনা আবহাওয়ায় শরীর ভাল রাখতে তাদের তেঁতুলের ঝোল চাই-ই চাই। দুপুরের খাওয়া খেত ঘুম থেকে উঠে বিকেল আড়াইটে তিনটের দিকে। সুবিধে থাকলে রাত্রির দিকে আবার যেত শিকারে। —মোটামুটি এই ছিল তাঁদের রাতদিনের কাজের তালিকা। যেদিন মনে করত জঙ্গলে যাবে না, খাল আর খাড়িতে মাছ ধরত নানা রকম জাল দিয়ে। ওরা তখন বনের রাজা বিশেষ—মনের সাধ মিটিয়ে হরিণ শিকার করছে, পাখি মারছে, মাছ ধরছে, কাঠ কাটছে। হরিণের মাংস কিন্তু নিজেরা খেত না, বিলিয়ে দিত স্থানীয় লোকেদের মধ্যে। হাঁস, হরিয়াল, বনমোরগ, শরাল, এই সব পাখি রান্না হত নিজেদের জন্যে।

কাজলপাতায় পৌঁছোবার আট দশ দিন পরে একদিন রাত দশটার দিকে যখন খোকনরা কেবল আহারে বসেছে, অমনি বাড়ীর বাইরের মাঠে শোনা গেল চিতলের টুঁই-টুঁই ডাক। ধনঞ্জয় ইঙ্গিতে জানাল হরিণের পাল এসেছে বাইরে। খাওয়া বন্ধ করে খোকনরা তিনজনেই বন্দুক রাইফেল নিয়ে বাড়ীর বাইরে এসে দেখে সামনের মাঠে দশ পনরটা চিতলের একটা পাল। খোকন নীচু গলায় বলে ওঠে, "বাড়ী বয়ে মরতে এসেছে ব্যাটারা!"—আকাশে তখন চাঁদ না থাকলেও, চোখে অন্ধকারটা খানিকটা সয়ে যেতে, খোকনরা অবাক হয়ে দেখে হরিণগুলো ঘুরছে ফিরছে, ঘাস খাচ্ছে ; আবার একটা আর একটাকে তেড়ে যাচ্ছে শিং বাগিয়ে। শহরের মানুষ তারা ; কখনো ভাবতে পারে নি, প্রকৃতির পটভূমিতে বন্য প্রাণীর

এমন খেলা দেখতে পাবে চোখের সামনে। ওরা তিনজনেই খাবার ফেলে উঠে এসেছিল, তাছাড়া নিজেরা হরিণের মাংস খায়ও না—এই রকম মানসিক অবস্থায় তখন আর নিরীহ প্রাণীগুলোর আহারে বিঘ্ন না ঘটিয়ে নিজেদের ভোজন শেষ করতে ফিরে গেল ভেতরে।

এরই মধ্যে একদিন খবর পাওয়া গেল লাইটহাউসের গার্ড একটা সাত-ফুটি চিতা মেরেছে তালপদা থেকে। পূর্ণিমার কয়েকদিন আগে বাহাদুর আর তার এক সাথী বসেছিল পদার একটা চুয়ার কাছের গাছে, হরিণ-বরা একটা কিছু মারবে বলে। মাঝ রাতে বাহাদুর তার দো-নলা সটগান থেকে পর পর দুটো তিন-ইঞ্চি এল-জি চালায় একটা ধেড়ে শুয়োরের মাথা লক্ষ্য করে—শুয়োর সহজে মরতে চায় না, তাই একই সঙ্গে দুটো গুলি খরচ করে বাহাদুর। বরাহজী এসেছিলেন চুয়া থেকে জল খেতে ; দুটো টোটার সীসের বলগুলো সরাসরি মগজে ঢুকে যেতে কয়েকবার ঘুরপাক খেয়ে মাটিতে পড়ে যায় শুয়োরটা। তারা গাছ থেকে নেমে এসে দেখে সেটাকে লাইটহাউসে বয়ে নিয়ে যাওয়া তাদের দু'জনের কম্ম নয়। লাইটহাউস সেখান থেকে মাইল-দেড়েকের মতো। ক'জন লোক ডেকে আনতে টর্চ ফেলতে ফেলতে দু'জনেই বেরিয়ে গেল বনের বাইরে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আবার তারা ফিরে আসে চারজন লোক সঙ্গে করে। আগের মতোই টর্চ ফেলে ফেলে নীরবে এগিয়ে যাচ্ছিল দলটা। কি দিনে, কি রাতে, নিঃশব্দে চলাই শ্বাপদ সংকুল জঙ্গলের নিয়ম। সরবে চললে মানুষের সাড়া পেয়ে একদিকে নিরীহ শিকার প্রাণীরা যেমন বনের গভীরে গা-ঢাকা দেয়, অপর দিকে তেমনি মাংসাশী হিংস্র পশুরা আকৃষ্ট হয় নরমাংসের লোভে। এগোতে-এগোতে শিকারের জায়গা থেকে বিশ ত্রিশ গজ দূরে টর্চ নিভিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বাহাদুর। টর্চ নেভালেও তখনো চাঁদ ছিল আকাশে। আশ্চর্য হয়ে বাহাদুর লক্ষ্য করে তার মড়িটার ওপরে আর একটা কি জন্তু যেন পড়ে আছে হুমড়ি দিয়ে। জন্তুটা ছিল বাহাদুরের দিকে পেছন

ফিরে। তাই বোধ হয় টর্চের হঠাৎ এক ঝলক আলোক জানোয়ারটা গ্রাহ্য করে নি। জঙ্গলের অভিজ্ঞতা গুরুংয়ের বিস্তর। সহজেই বুঝতে পারে যে, সেটা একটা মাংসাশী বাটপাড়, একটা চিতাবাঘ। চুয়ায় জল খেতে এসে দিব্বি পেয়ে যায় একই জায়গায় পানীয় আর খাসা চর্বিঅলা ভোজ্য। জন্তুটা চিতা বুঝতে পেরেই সঙ্গের লোকদের থামিয়ে দিয়ে বাহাদুর একলাই গুড়ি মেরে এগোতে থাকে মড়ির দিকে। এইভাবে পাঁচ-সাত গজ এগিয়ে বীরবাহাদুর চিতার দিকে বন্দুক তাগ করে অতি সন্তর্পণে সরতে থাকে পাশের দিকে। আট-দশ হাতের মতো পাশের দিকে সরে গিয়ে, মাটিতে উবু হয়ে পড়ে চিতাটার পিঠের বাঁদিক লক্ষ্য করে তুম করে কশে দিল একটা লেথালবল-বুলেট। জঙ্গলে ঢুকলে সর্বদা গুলিভরা বন্দুক নিয়ে চলাফেরা করে শিকারীরা। আচমকা বন্দুকের আওয়াজ আর গুলির ঘায়ে ঘায়েল হয়ে একটা প্রচণ্ড হাঁক মেরে বাঘটা শূন্যে লাফিয়ে ওঠে; তারপর মাটিতে পড়েই ছুট লাগায় জঙ্গলের দিকে। কিন্তু জঙ্গলে ঢোকার মুখেই সেটা মুখ থুবড়ে পড়ে যায়, আর ওঠে না। সে-রাতে আর চুয়ার দিকে ভিড়ল না কেউ, চিতাটার কি হল তা জানার জন্যে সকাল না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাই সঙ্গত মনে করল তারা। চিতাকে বিশ্বাস করা যায় না কোনক্রমেই। কেঁদো-বাঘ থেকে চিতা কম হিংস্র নয়। ভুলক্রমে মৃত মনে করে আহত চিতার কাছে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে বা সাংঘাতিক ভাবে ঘায়েল হয়েছে অনেক নামকরা শিকারী। বাকি রাতটা বাহাদুর আর তার সঙ্গীরা দূর থেকে শিকার দুটো পাহারা দিল, যাতে শেয়াল-হায়েনার মতো কোন চোর-জন্তু আবার তাদের শিকারে ভাগ বসাতে না এগোয়। পরদিন দেখা যায় চিতাটার বাঁ-দিকের ফুসফুস আর হৃদপিণ্ড ভেদ করে গলার ধার দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে গুলিটা। নার্ভের জোর ছিল বটে বাহাদুরের, রাত্রিতে মাটিতে থেকে খাবার-মুখে চিতার মোকাবিলা করা বড় সহজ কথা নয়!

তালপদার চুয়ায় যে কোন কোন চিতা জল খেতে আসে, এ-খবর জানা ছিল খোকনদেরও। গাছে মাচান তৈরী করে চিতা মারার চেষ্টা করার কথা ছিল তাদেরই। কথা ছিল শশধর আর অমলেন্দু বসবে সেই মাচানে। কিন্তু গড়িমসির জন্যে তাদের আর চিতা-শিকারে বসা সম্ভব হয় নি। চিতার অমন একটা রাজকীয় ছাল বেহাত হয়ে যেতে দলের মধ্যে কিছুটা ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেল এ নিয়ে।

কিন্তু তাদের শিকারী জীবনের এক বিরাট চমক তখনো অপেক্ষা করছিল তাদের ভীষণভাবে তাক লাগিয়ে দেবার জন্যে। বাড়ীর সামনে চিতলের পালটা দেখার আট-দশদিন বাদে শিকারীরা আলাদা আলাদা হয়ে শিকারে গেল। একটা দলে খোকনরা গেল দু'মাইলের মতো উত্তর-পশ্চিমের ফাঁকাতে, আর একটা দলে শশধররা গেল মাইল-দেড়েক উত্তর-পূর্বে। খোকন আর তার সঙ্গীরা বসল একটা পদার এক চুয়ার কাছাকাছি, চাপাটোপের গর্তে। ওদিকের মোষেলরা পদায় পদায় মোষ চরাত সময় সময়। মোষেদের জল খাওয়াবার জন্যে প্রতি পদায় দু'একটা চুয়া থাকতই। সেদিন শেষ-রাত পর্যন্ত বসেও মনের মতো শিকার পেল না খোকন। একবার এক দাঁতাল বরাহপুঙ্গব ঘোঁত-ঘোঁত করতে করতে ঢুকে পড়ল খোকনদের সামনের ফাঁকার ভেতরে, তাদের পনর-কুড়ি হাতের মধ্যে। চাঁদের আলোয় ঝকঝক করছিল তার দু'পাশের দুটো বাঁকানো সাদা দাঁত। রেগে গিয়ে সামনাসামনি কোন মানুষকে আক্রমণ করলে তার আর রক্ষে থাকে না ; তার গা-হাত-পা ছিঁড়ে ফেড়ে ফেলে এমন দাঁতাল। —ধীরে ধীরে এগোতে এগোতে এক জায়গায় কিছুক্ষণ থেমে আপন মনেই সে আবার তার সামনের ঝোপঝাড়ের ভেতরে গা ঢাকা দিল। অযথা তার পেছনে গুলি নষ্ট না করে চুপচাপ বসে থাকে খোকনরা। শেষরাত্রির দিকে তারা ফিরে চলল বাড়ীর দিকে। আধমাইলটাক একদিক দিয়ে চলার পর দলের গাইড গোপালের

কথামতো সর্টকাট করে চলতে লাগল আর এক দিক দিয়ে। বনের ভেতরে পথ বলতে ছিল না কিছুই। জঙ্গল কোথাও ঘন, কোথাও একটু হালকা ; কখনো কখনো জঙ্গলের ডালপালা টেনে সরিয়ে এগোতে হচ্ছিল তাদের। ওদিকের ভাষায় একেবারে কালাজঙ্গল! অমলেন্দু আর খোকনের পরনে সার্ট-সর্টস, পায়ে হান্টিংবুট ; বাকিদের খালি-গা খালি-পা। যে কোন মুহূর্তে বিষাক্ত সাপের দংশনে প্রাণ যেতে পারে দলের যে কোন লোকের। এই দিক দিয়ে পনর-কুড়ি মিনিট চলার পর গোপাল খোকনের কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বলে, "শুনতে পাচ্ছ খোকনবাবু?"

খোকন এতক্ষণ খেয়াল করেনি কিছু। বনের মধ্যে কত রকমের যে আওয়াজ হয়—সব শব্দ নিয়ে মাথা ঘামান যায় না। গোপালের কথায় কিছুক্ষণ কান পেতে থেকে খোকন বলে, "হ্যাঁ পাচ্ছি, কেমন একটা সাঁ-সাঁ সাঁই-সাঁই শব্দ না? সামুদ্রিক ঝড় আসছে না তো?"

গোপাল বলে, "ঝড় আসার মতো সোঁ-সোঁ শব্দই বটে, তবে ঝড় নয়।"

অমলেন্দু মন্তব্য করে, "বনবেড়াল নয়ত ভাম—কাছেই কোথাও কিছু একটা আপত্তিকর বিজাতীয় প্রাণী দেখে ঐ রকম ফোঁস ফোঁস করছে।

গোপাল সেদিকেরই লোক। সে একটা খারাপ কিছু অনুমান করে একটু জোর দিয়ে বলে, "না গো দাদা, সে সব নয়"।—খোকন তার তিন-সেলের টর্চটা একবার বনের ভেতরে চালিয়ে এদিকে সেদিকে দেখে নিয়ে বলল, "কিছু দেখা যাচ্ছে না। চল ডানদিক দিয়ে ঘুরে যাই, শব্দটা ভাল মনে হচ্ছে না। রাত্রিতে যাদের নাম করতে নেই, তাদের কেউ হবে হয়ত—কি রঙ্গ করছে কে জানে!"

বাড়ী পৌঁছোতে পুবদিক ফর্সা হয়ে গেল। শশধর তার দলবল নিয়ে আগেই ফিরে এসেছিল। সকলে একসঙ্গে হতে আলোচনা শুরু হয় কে কি শিকার পেল না পেল। ফোঁস-ফোঁসানির কথা

উঠতেই স্থানীয় লোকেরা বলল, বড়-বড় সর্পদানব আছে সেদিকে— পনর-যোল ফুটের এক একটা শঙ্খচূড়, আর পঁচিশ-ত্রিশ ফুটের অজগর ঘুরে বেড়ায় জঙ্গলের আনাচে-কানাচে। রেগে গেলে শঙ্খচূড় মাটিতে বিড়ে পাকিয়ে থেকেই সুপুরিগাছের খোলের মতো একটা লম্বাটে ফণা বিস্তার করে পাঁচ-সাত ফুট উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে ; সেই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই হঠাৎ মাটিতে শুয়ে পড়ে কোপ ঝাড়ে। তার একটা কোপের মানে আধ ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টার মধ্যে মানুষের অনিবার্য মৃত্যু। সে দিকে সময় সময় দেখা যায় বনের ভেতরে চরতে গিয়ে গরু মোষ মরে পড়ে আছে, পিঠে রয়েছে শঙ্খচূড়ের ছোবলের দাগ। একটা বয়সের শঙ্খচূড়ের পনর-কুড়ি হাতের মধ্যে পৌঁছে গেলে তীক্ষ্ণ শঙ্খধ্বনির মতো শব্দ করে সে নাকি আগন্তুককে আগে থেকেই সাবধান করে দেয়, "আমি এখানে আছি, আর এগিও না হুঁশিয়ার"।—শঙ্খচূড় পৃথিবীর সব থেকে বড় বিষধর সর্প। আবার পঁচিশ-ত্রিশফুটি চন্দ্রবোড়া শুয়োর হরিণ গিলছে তেমন দৃশ্যও সেদিকে দেখা যায় কখনো কখনো। সেদিকে বাঘ থেকেও ময়াল চন্দ্রবোড়া বেশি আতঙ্কের। জঙ্গলের ভেতরে-ভেতরে নিঃশব্দে সুড়-সুড় করে এগোতে এগোতে কখন যে তার গলাটা হঠাৎ শিকারের দিকে ছুড়ে দেবে, কিংবা ল্যাজে জড়িয়ে ধরবে কে জানে। একবার তার খপ্পরে পড়লে মুখের বড় বড় বাঁকা দাঁত, নয়ত পেটের দিকের দুটো বাঁকানো কাঁটা গেঁথে দেবে শিকারের শরীরে, আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে পাকে পাকে জড়িয়ে, তার হাড়গোড় পিষে দিয়ে, মুহূর্তের মধ্যে সেটাকে করে তুলবে একটা মণ্ডবিশেষ। তারপর ঘণ্টাখানেক ধরে সবটা গিলে ফেলে, একটা নিরিবিলি জায়গায় বিড়ে পাকিয়ে ঘুম লাগাবে কয়েক দিনের মতো, যে পর্যন্ত না সেটার সবটা হজম হচ্ছে। ভীষণ বদমেজাজী প্রাণী বিষহরীর এই রাম-চ্যালা !

সকালে চা খাওয়া আর শিকারের আলোচনা শেষ করে খোকনরা যখন স্নানের জন্যে চুয়ার দিকে যাবে, ঠিক সেই সময়ে টাঙ্গি হাতে

দু'জন কাঠুরে ছুটে এসে খবর দিল, জঙ্গলের ভেতরে এক জায়গায় ভীষণ ফোঁসফোঁসানি শোনা যাচ্ছে, কোন বড় নাগ হবে হয়ত। নাগটার ভয়ে তারা জঙ্গল কাটতে পারছে না। স্নান বন্ধ রেখে খোকনরা তিনজনেই লোকদুটোর সঙ্গ নিল। মাইলখানেক যাবার পর তারা একটা ঠাসা জঙ্গলের কাছে এসে পড়ল। সেখানে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল একটা ফোঁসফোঁসানি, কিন্তু জমাট জঙ্গলের জন্যে দেখা যাচ্ছিল না কিছুই। সেখান দিয়ে আর এগোতে না পেরে, সিকি মাইলের মতো ঘুরে একটা খালের ধারে এসে পৌঁছোল তারা। খালটা সেখানে পঁচিশ ত্রিশ হাতের মতো চওড়া। তাতে নোনা জলের মাংসাশী হিংস্র কুমীর আছে কি না ভাল করে বুঝে নিয়ে খালটা সাঁতরে ওপারে গিয়ে উঠল সকলে। ওপারে যেতে, আবার শোনা গেল ঝড়ের মতো গর্জন, কিন্তু তখনো দেখা গেল না কিছুই! টাঙ্গি দিয়ে জঙ্গল কেটে-কেটে আরো খানিকটা ভেতরে যেতে পাওয়া গেল খানিকটা ফাঁকা মতো জায়গা। এবার মনে হল শব্দটা আসছে সামনের কোন জায়গা থেকে। পঁচিশ-ত্রিশ হাত দূরে ছিল একটা মোটা সুন্দরীগাছ ; তার শেকড় থেকে অসংখ্য ছুঁচাল গোঁজ মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আছে সেকালের শূলের মতো। গোঁজগুলো এমনি সাংঘাতিক যে, অসাবধানে তার ওপর কারো খালি-পা পড়লে একেবারে এফোঁড়-ওফোঁড় হবে সন্দেহ নেই। মোটা গাছটার ক'টি চারাও ছিল তার চারপাশে। হঠাৎ মোটা গাছটার গোড়ার দিকে নজর পড়তে সকলের দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল জায়গাটায়। চোখ বড় করে সকলে দেখল এক অপরূপ চিত্রবিচিত্র দৃশ্য। নীচের দিক থেকে আড়াই-ফুট তিন-ফুট উঁচু পর্যন্ত জমে আছে জিনিসটা। কারো আর বুঝতে বাকি থাকে না সেটা কি। সকলে খুব সাবধানে এপাশে-সেপাশে নড়াচড়া করে বুঝতে চেষ্টা করে প্রাণীটা তার মাথাটা রেখেছে কোথায়, কিন্তু সাধ্যমতো চেষ্টা করেও পাওয়া গেল না তার মাথার হদিস। বেশি কাছে যেতেও সাহস নেই কারো—টের

পেলে কি ভাবে যে মূর্তিমান দানবটা আক্রমণ করবে জানে না কেউ।

গোপাল নিচুস্বরে বলল, "ব্যাটা একটা আস্ত জন্তু গিলে এখন মাথা লুকিয়ে দিব্বি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে"।

বিড়বিড়িয়ে খোকন বলে, "শান্তিতে নিদ্রাসুখ ভোগ করতে চেয়েছিল রাক্ষসী। যাতে তার ত্রিসীমানার মধ্যে কেউ না ভেড়ে তাই ফোঁসফুঁসিয়ে ভয় দেখাচ্ছে—'অ্যাই খবদ্দার কেউ কাছে ভিড়বি নে, আমি এখন ঘুমুচ্ছি। পেটেরটা হজম না হলে ওর আর সাড়া মিলবে না। কিন্তু ওর গায়ে গুলি করে লাভ নেই, দু'চারটে গুলি খেয়ে হয়ত জঙ্গলের ভেতরে গিয়ে লুকোবে, তখন হয়ত ওর আর পাত্তাই পাওয়া যাবে না। গুলি করতে হবে ওর ঠিক মাথায়।"

খোকন সুন্দরীগাছের দিকে বন্দুক বাগিয়ে প্রস্তুত হয়ে বসল। গোপাল একটা সুন্দরীর গোঁজ ভেঙে নিয়ে বেশ তাক করে ছুড়ে মারল দানোটার গায়ে। সেটা গায়ে লাগতেই অহিপুঙ্গব ঝাঁ করে মাথাটা ফুটখানেক শূন্যে তুলে ড্যাব-ড্যাব করে তাকিয়ে রইল বনের একদিকে। এই সুযোগেরই অপেক্ষা করছিল খোকন। সর্পপ্রবর যেই মাথা উঠিয়েছে, অমনি তার মাথা লক্ষ্য করে একটা ট্রিপল-A চালাল খোকন তার সটগান থেকে। গুলি খেতেই দানবটার মাথাটা টলে পড়ল কিছুটা নিচের দিকে, কিন্তু পাকের মধ্যে থেকেই তার সমস্ত শরীরটা অনবরত মোচড় খাওয়াতে লাগল এক অজ্ঞাত যান্ত্রিক পদ্ধতিতে। আধঘণ্টার মধ্যেও তার মোচড়ানি বন্ধ হল না দেখে, খোকন এবার তার শিরদাঁড়া বরাবর কশল একটা আড়াই-ইঞ্চি এল-জি। এতক্ষণে বন্ধ হল যমটার মোচড়ামুচড়ি। গুলির আওয়াজ শুনে জঙ্গলের এদিক-ওদিক থেকে টাঙ্গি হাতে দশ-বারজন কাঠুরে পৌঁছে গেল সেখানে। খোকনের কথায় তারা এবার টাঙ্গির পেছনের দিক দিয়ে দানবটার শিরদাঁড়া বরাবর জোরে জোরে ঘা দিতে লাগল, যাতে সেটা একেবারে অকেজো হয়ে যায়। অজগরটা স্থির হয়ে

গেল, তার শরীরের পাক খুলতে গিয়ে দেখা গেল সে এক কঠিন কাজ। ঘণ্টাখানেক লেগে গেল তার পাক আলগা করতেই। গাছ আর চারার সঙ্গে দানবটার যুদ্ধাযুদ্ধির ফলে চারা গাছগুলোর অবস্থা হয়েছিল কলে রস নিংড়ান আস্ত আখের মতো।

গাছ থেকে সাপটা নামিয়ে দেখা গেল সেটা আঠার হাত লম্বা। অর্থাৎ সাতাশ ফুট ; বেড় প্রায় চব্বিশ ইঞ্চি। তার মাথাটা ছিল একটা ছোটখাটো কুলোর মতো, আর হাঁ-মুখটা একটা কালো কদাকার জন্তুর মুখের ধরনের। সেটার ওজন কত ছিল ঠিক জানা যায় নি। চারটে ডালের সঙ্গে বেঁধে রাক্ষসটাকে বাড়ীতে বয়ে নিতে লোক লেগেছিল আটজন। মনে হয় সেটা চার-পাঁচ মনের কম ছিল না। চামড়া ছাড়াবার সময় সাপটার পেট ফাঁসিয়ে বোঝা যায় কয়েক ঘণ্টা আগেই একটা আধমনী বরাহ দিয়ে ভোজ সেরেছিল সে ; তখনো তার পেটের মধ্যে পড়ে ছিল শুয়োরের ঘাড়ের শক্ত কুচি, আর হজম না হওয়া আধখানা দলাপাকানো বরাহ-দেহ।

ত্রিশ বছর আগেকার ঘটনা হলেও, আজও সুনির্মল শাসমল যত্ন করে কাপড়ে জড়িয়ে তুলে রেখেছে কাজলপাতার সেই সাতাশফুটি অজগর দানবের চকচকে চামড়াটা, শুধু এই কথাটাই বোঝাবার জন্যে যে, অজগর কেবল গল্পের বইয়ের বিভীষিকাই নয়, এখনো পাহাড় আর সমতলের বনে জঙ্গলে চরে বেড়ায় বিস্তর সত্যিকারের জন্তুগেলা অজগর।

সুচরণের শ্রীচরণে বাঘ



বছর-দশেক আগে আমলামিথির বাঁধের অফসাইডে আসল সুন্দরবনী যে-বাঘটা রাইফেল আর সটগানের গুলিতে ঝাঁজরা হয়ে মারা পড়ে,

মাথা সুদ্ধ তার ছালটা আজও সুনীলবাবুর বৈঠকখানার একটা সোফার শোভা বর্ধন করছে। বাঘটার কশের দেড়-দু'ইঞ্চি লম্বা এক একটা দাঁত এখনো ঝকঝক করছে গজদন্তের মতো। মস্ত মাথাটা এখনো যেন দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ঠিক সেই ভঙ্গিতে, যে ভঙ্গিতে বাঘটা চার চারটে গুলি খাবার পরেও পেছনের দু'পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে তাকিয়েছিল পাশ-শিকারী সুচরণের শ্রীচরণ কামড়ে ধরার আগের মুহূর্তে। আজ তার রাজ-পোশাকের মতো খোলস, বিরাট মাথা, চোখের তীব্র চাহনি, সবই যেন বন্দুক-রাইফেলধারীদের বীরত্বকে ব্যঙ্গ করছে, তাদের চরিত্রের প্রতি জানাচ্ছে অপরিসীম ঘৃণা আর ধিক্কার!

আমলামিথি হল দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিদ্যা নদীর পশ্চিম তীরের একটা লাট অঞ্চল। কলকাতা থেকে ক্যানিং রেলে, সেখান থেকে লঞ্চে গোসাবা—বাকি পথটা বিদ্যা নদী ধরে নৌকোয় পৌঁছোতে হয় আমলামিথি দ্বীপে। সত্তর-আশি বছর আগে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বহু জঙ্গল জমি কতকগুলি লটে, অর্থাৎ কতকগুলো অংশে ভাগ করে বন্দোবস্ত দেওয়ার সময় আমলামিথি দ্বীপের দশ-বার হাজার বিঘা জঙ্গলও উৎসাহী মহাজনদের মধ্যে বিলি করেছিল ব্রিটিশ সরকার। এই লটে ভাগ করা জমি থেকেই নাকি সুন্দরবন অঞ্চলের আবাদি জমির নাম হয়েছে লাটের-জমি। আমলামিথি-লাটে কাজলদেরও ছিল চার হাজার বিঘা জঙ্গল জমি। এককালে গোটা অঞ্চলটাই ছিল বাঘ-বরা-হরিণের আড্ডাখানা। জন্তু-জানোয়ার মেরে, জঙ্গল কেটে পরপর তারা তৈরী করেছে আবাদি জমি, আর মাছের ভেড়ি।

আমলামিথির সোজাসুজি বিদ্যা নদীর অপর পারেই রয়েছে বড়-বড় রিজার্ভ ফরেস্ট ; তার ভেতরে ভেতরে এখনো দেখতে পাওয়া যায় নানা চেহারার ভাঙা-ভাঙা পাকা গাঁথুনি—লোকে বলে সেখানে নাকি এককালে পর্তুগীজদের দুর্গ ছিল।

সেদিকের বন বা আবাদি জমি, সবই হয় কোন দ্বীপে না হয়

বদ্বীপে অবস্থিত। যাতে জোয়ারের সময় আবাদি দ্বীপে নদীনালার নোনা জল ঢুকে চাষ আবাদের ক্ষতি করতে না পারে, তার জন্যে উঁচু বাঁধ দেওয়া আছে দ্বীপের ধারে ধারে। বাঁধ আর নদীর মধ্যে দু-তিন'শ গজ জায়গা ছেড়ে দেওয়া থাকে, যাতে জোয়ারের জল সব সময় বাঁধের ক্ষতি করতে না পারে। লাটের লোকেরা বাঁধ আর নদীর মধ্যেকার এই ধরনের জায়গাকে বলে অফসাইড। এই অফসাইডেও থাকে বানী-গামা-গরাণ-গর্জন-ক্যাওড়া-হেঁতাল প্রভৃতি সুন্দরবনের মার্কামারা নোনা গাছের ঝোপঝাড়—কোথাও ঘন, কোথাও হালকা ছাড়া-ছাড়া।

দশ-বার বছর আগে এক জোড়া কেঁদো বাঘ বিদ্যা পেরিয়ে চলে এসেছিল আমলামিথির সেই অফসাইডের জঙ্গলে। দিনের বেলায় বাঘ দুটো লুকিয়ে থাকত নদীর ধারের ঘন জঙ্গলে, আর রাত্রিতে রাত্রিতে বাঁধ পেরিয়ে এসে গেরস্তদের বস্তিতে হানা দিয়ে গরু-ভেড়া তুলে নিয়ে ভাগারাম দিত ক'দিন বাদে বাদেই। বাঁধের এদিকে সেদিকে তাদের পায়ের ছাপ থেকে বোঝা যাচ্ছিল দুটো বাঘই বেশ বড়সড়। দুটো বাঘকে নিকেশ করা তো আর সহজ ব্যাপার নয়! সেদিকে বেশির ভাগ লোকই চাষী-শ্রেণীর। কোথাও কোথাও লাটদার-চকদারদের বন্দুক থাকলেও, তা দিয়ে শুধু চোর-ডাকাতদেরই ভয় দেখান যেত, সুন্দরবনের বাঘ মারার মতো এলেম ছিল না কারো। বাঘ ঠেকিয়ে রাখার জন্য আবাদির লোকেরা দিনের বেলায় ঘরের বাইরে কাঠকুটো জড়ো করে রাখতো ; রাত্রিতে কোন দিকে বাঘের সাড়া পেলেই সেই কাঠের গাদায় আগুন লাগিয়ে দিত—বাঘ ভয় পেয়ে পালিয়ে যেত অন্য দিকে। আবাদির লোকেদের ভাগ্য ভাল যে মানুষের দিকে বাঘ-দুটোর নজর ছিল না। কিন্তু নজর পড়তে আর কতক্ষণ!

কাজল সে-সময় কলকাতায় তার বিষয়-আশয় নিয়ে ব্যস্ত। বাঘ দুটো আমলামিথির অফসাইডে দেখা দেবার আট-দশ দিনের

মধ্যে খবরটা পৌঁছে গেল কাজলের কানেও। চার-পাঁচ দিনের মধ্যে তার দেশের আরো দু'জন শিকারীকে নিয়ে কাজল পৌঁছে গেল আমলামিথিতে। পথে গোসাবা বাজারে এক চায়ের দোকানে হারু নামে এক শিকারীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল কাজলদের। হারু তার দো-নলা সটগান নিয়ে একলা একলা ক'দিন ঘোরাঘুরি করেও কোন বাঘের দেখা পায়নি সেখানে। কিন্তু বুঝতে পেরেছিল সেখানে বাঘ আছে। সে অবশ্য একটা-বাঘের কথাই বলল—সেখানে দুটো বাঘ আছে তার বিশ্বাস হয় নি। একলা-একলা বাঘের মোকাবিলা করতে না পেরে বাড়ীতে ফিরে যাচ্ছিল হারু। শিকারী-দলটা দেখে সেও তাদের সাথে আবার চলল আমলামিথি-লাটে।

কাছারিতে পৌঁছে সেখানকার কর্মচারী আর স্থানীয় লোকেদের কাছে বাঘের খবর নিল কাজলরা। সেখানে দুটো বাঘই এসেছিল ঠিক, আগুন-টাগুন দেখে ভয় পেয়ে কোন্ দিন যেন একটা বাঘ ফিরে গিয়েছে নদীর ওপারের জঙ্গলে। আমলামিথি জায়গাটা যে এমন গোলমেলে, আর সেখানে তার বাড়ীর জঙ্গলের মতো হরিণ-বরা নেই আগে জানলে সে বোধ হয় এই বেপরোয়া অভিযানে পা বাড়াত না। যে বাঘটা রয়ে গিয়েছে, সেটা উপদ্রব করতে থাকলেও তা তখনো চরমে পৌঁছোয়নি। কিন্তু সেটা যে কখন কি রূপ ধারণ করবে কে বলতে পারে!

পরদিন সকলে চা খেয়ে বেলা আটটার দিকে শিকারী, পাশ-শিকারী, আর জঙ্গল বিট করার লোকজনের একটা বড় দল নেমে পড়ল অফসাইডের জঙ্গলে। শিকারের সময় শিকারীর পাশে থেকে তাকে যে সাহায্য করে, তাকে পাশ-শিকারী বলে।

বাঁধের ধারে-ধারে সিকি-মাইলটাক চলার পর একজন বিটার দেখাল, মাটিতে বাঘের টাটকা থাবার দাগ, আর তার পরিত্যক্ত অন্য পদার্থ—বোঝা গেল জানোয়ারটা আধ ঘণ্টা আগেও ছিল সেখানে। সকলেই হুঁশিয়ার হল। সুনীলবাবুর পয়েন্ট ফোর-টু-থ্রি রাইফেলের

ম্যাগাজিনে আগে থেকেই পাঁচটা সফটনোজ-বুলেট ঠাসা ছিল; এবার সেফটি-ক্যাচটা আলগা করে দিয়ে রাইফেলটা প্রস্তুত করে নিলেন। কাজল, হারু, আর বিক্রম তিনজনের হাতেই দোনলা বন্দুক; কোনটাতে স্ফেরিক্যাল বল, কোনটাতে কণ্ট্রাকটাইল সলিড—সবই বাঘমারা গুলি। তারা যখন হুঁশিয়ার হয়ে সেই দিকের জঙ্গল বিট করার জন্য তৈরী হচ্ছে, তখন একজন লোক বাঁধের ওপর দিয়ে আসতে আসতে খবর দিল বাঘটা রয়েছে সেখান থেকে মাইল খানেক দক্ষিণ-পুবে, অফসাইডের জঙ্গলে। খবর শুনে সুনীলবাবু তাঁর রাইফেলের সেফটি ক্যাচটা লাগিয়ে দিলেন, যাতে চলতে-চলতে হঠাৎ বুলেট ছুটে না যায়। সকলে বাঁধের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলল বাঘের খোঁজে। হাঁটতে-হাঁটতে সকলে এক জায়গায় পোঁছে দেখতে পেল, বন্দুক হাতে একটি লোক বাঁধ থেকে প্রায় এক'শ গজ দূরের একটা গরাণ গাছের উঁচুর দিক থেকে কিছুটা নেমে এসে আবার উঠে গেল ওপরের দিকে; আবার গাছ বেয়ে কিছুটা নামল, আবার তাড়াতাড়ি উঠে গেল ওপরে। লোকটার কাণ্ড দেখে শিকারী দলটা বুঝতে পারল বাঘটা সেখানেই আছে ধারে-কাছে কোথাও। লোকটা কাজলদের দলটা দেখে এবার সাহস পেয়ে গাছ থেকে নেমে একটু ঘুরে ঘুরে চলে এল কাজলদের কাছে। লোকটার হাতে ছিল একটা এক-নলা সটগান। লোকটার রকম সকম দেখে খুব খানিকটা হাসাহাসি করল সকলে —একটা এক-নলা বন্দুক নিয়ে বাঘ শিকারের চেষ্টায় ছিল সে; কিন্তু বাঘের চেহারা দেখে পালিয়ে আসার পথ পাচ্ছিল না। লোকটার কাছে বাঘের বর্ণনা আর সেটা ঠিক কোথায় আছে বুঝে নিয়ে দলটাকে সাজিয়ে ফেললেন সুনীলবাবু—কাজল গেল নদীতে; একটা ডিঙায় বসে বন্দুক উচিয়ে রইল অফসাইডের জঙ্গলের দিকে। হারু আর শিকারী বিক্রম বিটারদের সঙ্গে সেই পাগলা শিকারীর গাছটা থেকে কয়েক'শ গজ দক্ষিণে চলে গেল জঙ্গল বিট করতে। সুনীলবাবু বসলেন বাঁধের ওপরে, সেখানে বিদ্যা নদীর একটা পনর-

কুড়ি ফুট চওড়া মজা খাড়ি এসে থেমে গিয়েছে—বড় জোয়ারের সময় খাড়িটা জলে ভরে যায়। অন্য সময় তাতে থাকে শুধু নরম পলি। খাড়ির এই মাথার মাঝামাঝি বসে সুনীলবাবু ভাবছিলেন, বাঘটা তাড়া খেয়ে খাড়ির মধ্য দিয়ে ছুটে যেতে গেলে কাদার জন্য তার গতিবেগ অনেকটা কমে যাবে নিশ্চয় ; সেই সুযোগে তিনি জানোয়ারটাকে ঘায়েল করতে পারবেন অনায়াসে। কিন্তু ঘটনা ঘটল অন্য রকম। বাঘটা যেমনই ভারিসারি, তেমনি চতুর। বিটাররা যখন দূর থেকে টিন পেটাতে পেটাতে এগিয়ে আসছিল, সেই সময় একবার শোনা গেল দানবটার একটা চাপা গর্জন। তার একটু পরেই দেখা গেল এক বিরাট শার্দূল-পুঙ্গব রাজকীয় ভঙ্গিতে একটা হেঁতাল-ঝোপ থেকে আর একটা হেঁতাল-ঝোপে লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে আসছে খাড়ির দিকে। সুনীলবাবু রাইফেলের সেফটি ক্যাচটা আবার আলগা করে প্রস্তুত হলেন গুলি করার জন্যে। বাঘটা যত এগিয়ে আসছিল খাড়ির দিকে, সুনীলবাবুও তত বেশি হুঁশিয়ার হয়ে রাইফেল তাগ করছিলেন খাড়ির ভেতরের দিকে। সুনীলবাবুর পুরো প্ল্যানটা বুঝতে পেরেই বোধ হয় জানোয়ারটা খাড়ির কাছাকাছি এসেই খাড়িটা শূন্য দিয়ে পার হয়ে যাবার জন্যে মারল এক লম্বা লাফ। সুনীলবাবু শয়তানটার এই কাণ্ডের জন্যে একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। বাঘটা লাফ দিতেই সুনীলবাবুও রাইফেল চালালেন শূন্যে। গুলি বাঘটার গায়ে-মাথায় না লেগে লাগল তার সামনের দিকের বাঁ-পা'র থাবার একটু ওপরে ; বাঘ তবু পৌঁছে গেল খাড়ির অপর পারে। সেখানে পড়েই একটা প্রচণ্ড হাঁক ছেড়ে বাঘটা ঝট করে ঢুকে গেল নদীর ধারের জঙ্গলে। খাড়ির ওপারে বাঘটা যেখানে লাফিয়ে পড়েছিল, দেখা গেল সেখানে পড়ে আছে বাঘের খানিকটা রক্ত, আর কয়েক টুকরা হাড়।

শিকারীদের দলটা চলে এসেছিল কাজলদের কাছারি-বাড়ী থেকে প্রায় দেড় মাইল দক্ষিণ-পুবে ; এবার তারা বাঘটার গতিপথের দিকে

চোখ রেখে ধীরে-ধীরে ফিরে চলল কাছারির দিকেই। পঞ্চাশ গজের মত গিয়ে সকলে দেখল এক জায়গায় জঙ্গলের ওপরে হঠাৎ কয়েকটা কাক ডাকাডাকি করছে। বোঝা গেল জানোয়ারটা সেখানে দাঁড়িয়ে পড়েছে—বোধহয় পায়ের ব্যথায়। বিটাররা তখনো বাঘটাকে ধাওয়া করেই চলেছে। তাড়া খেয়ে বাঘটা আবার চলতে লাগল ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে। একবার তাকে একটু ফাঁকায় দেখতে পেয়ে স্থনীলবাবু আর একটা বুলেট ছাড়লেন তার বুক লক্ষ্য করে, কিন্তু গুলিটা বেরিয়ে গেল বাঘটার পেটের তলা দিয়ে। গুলির শব্দে ভয় পেয়ে বাঘটা এবার পাশের একটা জঙ্গলে গা-ঢাকা দিল। এই জঙ্গলটার পরেই ছিল একটা খাল, আর তার পরেই একটা বড় ঘন জঙ্গল। যদি বাঘটা একবার সেখানে ঢুকে পড়ে তবে তাকে আবার বের করা কঠিন হবে ভেবে, এবার বিটারদের পাঠান হল বাঘটার উত্তর দিক থেকে জঙ্গল পেটানোর জন্যে। গোসাবার শিকারী হারু এই সময় অফসাইডের মাঝামাঝি একটা ছোট ক্যাওড়া-গাছে গিয়ে উঠল। বাঘটা তাড়া খেয়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলে তাকে কায়দা মতো গুলি করা যাবে ভেবেছিল সে। এদিকে হারুকে গাছে উঠতে দেখেই স্থচরণ নামের এক পাশ-শিকারীও গিয়ে উঠল সেই ক্যাওড়া-গাছেই। হারু যে-ডালে দাঁড়িয়েছিল, স্থচরণ সেই ডালের ফুট তিনেক নীচের একটা ডালে গিয়ে বসল পা ঝুলিয়ে—মাটি থেকে তার পা থাকল মাত্র পাঁচ-ছ' ফুট উঁচুতে। স্থনীলবাবু বার বার স্থচরণকে নেমে আসতে বললেন, কিন্তু কোন কথাই শুনল না সে—বলল, সে হারুকে সাহায্য করবে, ভয় পায় না সে, জীবনে অনেক কিছু দেখা আছে তার। কিন্তু কাজটা যে তার পক্ষে নিতান্তই বর্বরোচিত হয়েছিল তা বোঝা গেল একটু পরেই।

ওদিকে বিটাররা কাজ শুরু করতে গিয়ে লক্ষ্য করল জঙ্গলের মধ্যে এক জায়গায় সাদামতো কি যেন দেখা যাচ্ছে। সেটা একটা গামা গাছের গুঁড়িও হতে পারে, আবার শুয়ে থাকা বাঘের গলাও

হতে পারে। বিক্রমজিৎ তখন দাঁড়িয়ে ছিল বাঁধের ওপরেই। তাকে সেই সাদা জিনিসটা লক্ষ্য করে গুলি চালাতে বলা হল। বিক্রম বিটারদের কাছে গিয়ে, পকেটে বাঘমারা দু'রকম গুলি থাকতেও কৃপণতা করে একটা দু'নম্বর ছররা গুলি চালাল সেই সাদা জিনিসটা লক্ষ্য করে। দেখা গেল ছিটে-গুলি যে সাদা জিনিসটাকে ঘা দিল, সেটা আসলে বাঘের গলা ছিল, গাছ-টাছ নয়। গুলি বাঘের গলায় লাগল ঠিকই, কিন্তু তাতে তার হল না কিছুই। ছিটে-গুলি না চালিয়ে বিক্রম যদি একটা স্ফেরিক্যাল বা কণ্ট্রাকটাইল কশে দিত, তা হলে সম্ভবত মারটা মোক্ষম হত। ছিটে গুলি খেয়ে বাঘটা আবার গর্জন করতে করতে রওনা দিল যে-দিক থেকে এসেছিল সেই দিকে, আর চলতে চলতে এসে পড়ল একেবারে সুচরণ-হারুদের ক্যাওড়া গাছের ধারেই। জানোয়ারটা গাছের খুব কাছে আসতেই হারু ওপর থেকে তার পিঠ লক্ষ্য করে একসঙ্গে টিপে দিল বন্দুকের দুটো ট্রিগার—গুলি দুটো লাগল পিঠে, শিরদাঁড়ার একটু ধারে। মাটিতে পড়ে গিয়ে ভীষণভাবে গর্জাতে লাগল বাঘটা। দেখতে-দেখতে রক্তে ভেসে গেল সেখানকার সাদাটে নোনা মাটি। কিছু পরে বাঘটার গর্জন থামল বটে, কিন্তু সে মরল না। সুচরণ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল বাঘটা তখনো নিঃশ্বাস নিচ্ছে। বাঘটার অবস্থা দেখে সুচরণ চেঁচিয়ে বলে উঠল, "বাবু, শয়তানটা মরেনি গো, ফের গুলি কর।"—বাঘটার মরতে আর দেরী নেই ভেবে সুচরণ পা ঝুলিয়ে রেখেই নিশ্চিন্তে বলেছিল কথাগুলো। কিন্তু সুচরণের মুখের কথা শেষ হতে না হতেই সেখানে ঘটে গেল এক ভীষণ কাণ্ড, যেমন কাণ্ড আর কখনো কোথাও ঘটেছে কি-না সন্দেহ। বাঘটা বোধ হয় বুঝতে পেরেছিল সুচরণের কথাগুলো ; তাই বদলা নেবার জন্যে জানোয়ারটা নিমেষের মধ্যে লাফিয়ে উঠে গোঁ-গোঁ করতে করতে ছুটে গেল ক্যাওড়া গাছের কাছে ; গাছের কাছে পৌঁছেই দানবটা পেছনের দু'পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে সুচরণের মুখের দিকে বিকট ভঙ্গিতে

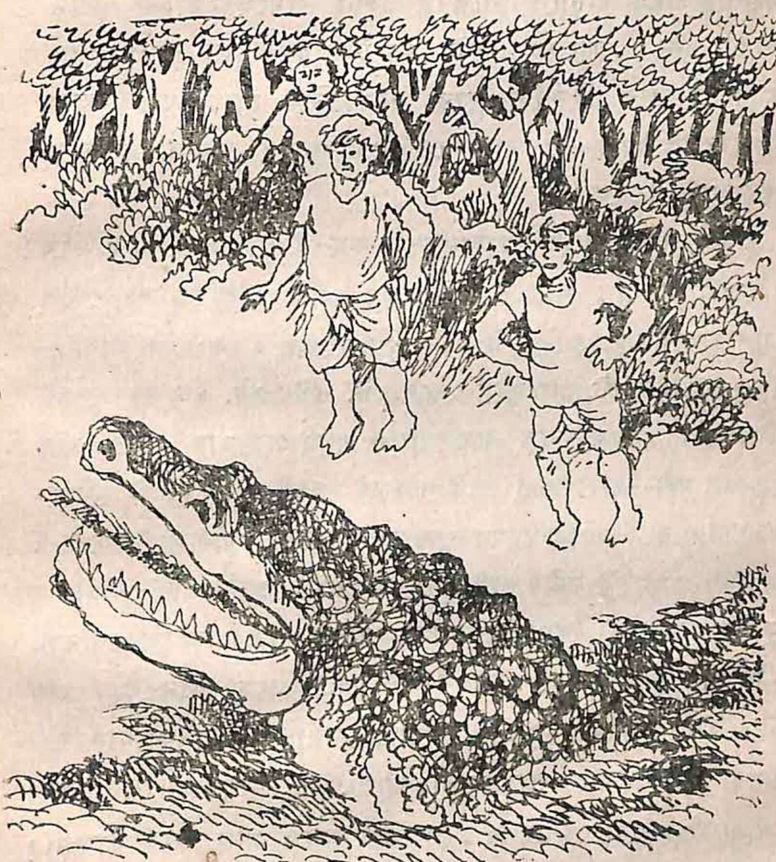
তাকাতে তাকাতে সামনের বাঁ পায়ের থাবাটা ঠেকাল গাছটার গুঁড়িতে, তারপর সেইভাবে দাঁড়িয়ে থেকেই সামনের দুটো থাবা দিয়ে চেপে ধরল সুচরণের ডান পায়ের উরু, আর সেই ভাবে থেকেই তার সেই পায়ের গিঁটের কাছে কামড়ে ধরে তাকে টেনে নামাল গাছ থেকে। এরকম একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য কল্পনা করতেও গায়ে কাঁটা দেয়! ঘটনাটা ঘটে গেল বিদ্যুৎ চমকের মত। সুচরণ তার মাথার উপরের ডালটা যার উপরে দাঁড়িয়েছিল হারু, সেটা ধরে কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি করেও নিজেকে গাছের উপরে রাখতে পারল না; মাটিতে পড়ার সময় মড়াৎ করে ভেঙে পড়ল তার হাতের ডালটাও। সুচরণ নীচে পড়ে যেতেই বাঘটা তার শরীরের ওপর দিয়ে এগিয়ে এল তার মাথাটা কামড়াতে। নিরুপায় সুচরণ তখন চিৎ হয়ে পড়ে থেকেই দু'হাত দিয়ে রাক্ষসটার হাঁ-করা মুখের দু'ধারে চেপে ধরে তার এগোনো ঠেকাতে চেষ্টা করছিল প্রাণপণে। গুলি খেয়ে-খেয়ে জানোয়ারটা বেশ কাবু হয়ে পড়েছিল বলেই বোধ হয় সেটাও আর বেশি জোর খাটাতে পারছিল না। ওদিকে বাঘটা সুচরণকে গাছ থেকে টেনে নামাবার সময় হারুর পা রাখার ডালটা ভেঙে পড়লে তাকেও সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে পড়তে হয়েছিল নীচে—গাছ আঁকড়ে ওপরে থাকা তার পক্ষে আর তখন সম্ভবই ছিল না, কারণ বন্দুক-হাতে বসে বা ঝুলে থাকার মতো আর তেমন ডালও ছিল না সেই গাছের উঁচুতে। একটু পেছনের দিকে পড়ায় বাঘটা তাকে দেখতে পায়নি বোধ হয়; সেটা তখন সুচরণকে নিয়েই ব্যস্ত। নীচে পড়েই বন্দুকে আর একটা কার্তুজ পুরে নিয়ে খুব সাবধানে আবার গুলি চালাল হারু। গুলির ধাক্কায় এবার বাঘটা ছিটকে পড়ল সুচরণের ডান ধারে। কিন্তু কোন মারই মোক্ষম হয় নি এ পর্যন্ত; তাছাড়া বাঘের জীবনী-শক্তিও অতি প্রচণ্ড! তাই পড়ে গিয়েও বাঘটা আবার গোঙাতে-গোঙাতে ওঠার চেষ্টা করতে লাগল।

এদিকে বাঁধের ওপর সুনীলবাবুর পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল সুচরণের

পনর-ষোল বছরের একটি ছেলে ; গাছ থেকে তার বাবাকে টেনে নামাতে দেখেছিল সে। ছেলেটা "বাবাকে বাঘে ধইরল্যা গো, খাইলা গো", বলে চিৎকার করে কেঁদে উঠল। একটা ঝোপের ওপর দিয়ে সুনীলবাবুও পরিষ্কার দেখতে পেয়েছিলেন দানবটার সুচরণের পা জড়িয়ে ধরার সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য। সুনীলবাবু রাইফেল বাগিয়ে ধরে ক্যাওড়া-গাছটার কাছে ছুটে গিয়ে দেখেন হারু তখন পাশাপাশি বাঘ আর সুচরণের কাছ থেকে একটু উত্তরে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সুচরণ মরার মতো পড়ে আছে মাটিতে, প্রায় বিবস্ত্র। বাঘটা কোন রকমে দাঁড়িয়ে উঠে যন্ত্রণায় আর ঘৃণায় হারুর দিকে দাঁত খিঁচোচ্ছে—বোধ হয় তখন তার আর এগোবার শক্তিও ছিল না দেহে। সুনীলবাবু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে তাঁর তৃতীয় বুলেটটি কশে দিলেন বাঘের কপাল লক্ষ্য করে। এবার একটা দুর্বল হাঁক ছেড়ে বাঘটা যে পড়ল আর উঠল না। শেষ হ'ল তার বাঁচার জন্যে সংগ্রাম। পুরো জোয়ান বাঘ। লালচে বাদামী রঙের—পাক্কা ন'ফুট।

বাঘের দাঁতে পাঁচ-টুকরো হয়ে ভেঙে গিয়েছিল সুচরণের ডান-পায়ের হাড়। দেড়-দু'মাস চিকিৎসার পর তার পা-টা সারল বটে, কিন্তু আগের দশায় আর ফিরল না। বাঘটা মারা যাবার পর অনেক দিন গত হয়ে গেলেও, সেদিনের তার দু'পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে আক্রমণ করার সেই-ভঙ্গিটার স্বপ্ন দেখে সুচরণ বহুদিন পর্যন্ত ঘুমের ঘোরে ভীষণ ভাবে চিৎকার করে উঠত। তবু বলতে হবে সুচরণ সাহসী বটে। মজার কথা হল হাসপাতালে থাকার সময় তাকে যারা দেখতে যেত, তাদের সে পকেট থেকে বের করে এক-গোছা বাঘের গোঁফ দেখাত। বাঘের হাঁ-এর নীচে মরতে বসে সে যে আবার কখন তার গোঁফ ছিঁড়ে পকেটে পুরল, তা সে নিজেও বলতে পারত না।

সর্বেশ্বরের কুমির শিকার



বাঘ যে কুমিরকে ভয় করে, খালে-খাড়িতে নামতে হলে সুন্দরবনের একটা কেঁদো-বাঘকেও যে অনেক হিসেব করে জলে নামতে হয়, এমন আজব কথা কেউ সহজে বিশ্বাস করতে চায় না। কিন্তু সুন্দরবনের ধনচী-তমলুকচড়া অঞ্চলের একটা প্রমাণ সাইজের কুমিরের

কথা যদি বলি, তাহলে শুধু বাঘ কেন, গণ্ডার-হাতিও যে কুমিরকে সমীহ করবে, তেমন কথাও বিশ্বাস করতে হবে। একটা বড় কুমির লম্বায় পঁচিশ ফুট, চওড়ায় তিন ফুট, আর খাড়াইতে আড়াই ফুট হওয়া অসম্ভব নয়। একটা এক-টন ওজনের কুমির নাকি বার-টন ওজনের মত বল খাটাতে পারে। একটা এদেশের হাতির ওজন তিন-চার টন। কাজেই একটা এক-টনি কুমির যে বাগে পেলে একটা হাতিকে হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে যাবে, তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে—একবার জলে নেমে পড়তে পারলে, কুমিরকে তখন আর পায় কে !

সুন্দরবনের সব নদী-মোহানাতেই কম-বেশি কুমির থাকে, তবে কয়েকটা জায়গায় কুমিরের উপদ্রব খুব বেশি। কুমির সব থেকে বেশি সপ্তমুখী নদীতে। এই নদীর পুবে রয়েছে কতকগুলো আবাদি-দ্বীপ—বুড়াবুড়িতট, রাক্ষসখালি, এল-প্লট, এইচ-প্লট, এই সব। এই দ্বীপগুলোর ভেতর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে জগদ্দল নদী—ধারাগুলো সবই পড়েছে সপ্তমুখীতে। দক্ষিণ চব্বিশ-পরগণার বনে-জঙ্গলে যেমন সুন্দরবনী বাঘের দৌরাত্ম্য, ঠাকুরান, জগদ্দল, সপ্তমুখী নদীর আশপাশের গ্রামে তেমনি নদী-মোহানার কুমিরের উপদ্রব। জোয়ারের সময় নদী বা সমুদ্রের জল বন-এলাকার নীচু জমিতে ঢুকে পড়লে, মাছ-কাঁকড়া খেতে এসে কোন-কোন জন্তু পড়ে যায় কুমিরের মুখে। আবার, নোনা-জল আটকানোর জন্য আবাদি-দ্বীপের ধারে-ধারে যে বাঁধ আছে, তার বাইরের দিকের জঙ্গলা জমিতেও জোয়ারের জলের সঙ্গে উঠে আসে মাছ আর কাঁকড়া ! গ্রামের মেয়ে-বৌরা সেই-সব কুড়োতে এলে, নদী বা খালের কুমির সময়-সময় তাদের অলক্ষিতে গুটি-গুটি এগিয়ে এসে কাউকে-কাউকে টেনে নিয়ে গিয়ে জলে ডুব মারে।

পনর-কুড়ি বছর আগে একবার জগদ্দল নদীর ধারের গ্রামগুলোতে শুরু হল ভীষণ কুমিরের অত্যাচার। জল-জঙ্গলের ধারে কাছেও

যাবার উপায় ছিল না তখন। এক দিন ভরা জোয়ারের সময় এল-প্লটের দক্ষিণ-দিকের বাঁধের ওপরে দাঁড়িয়ে একটা গোল জাল দিয়ে মাছ ধরছিল গ্রামের এক চাষী-বউ। বাঁধের বাইরের দিকে জল তখন মাত্র ফুটখানেক নীচে। বাইরের জঙ্গলটাতেও তখন জোয়ারের জল থৈ-থৈ করছে। কোথায় যে একটা মানুষ-খেকো কুমির ওত পেতে লুকিয়েছিল, বউটা জানতে পারে নি একটুও। হঠাৎ বাঁধের বাইরের জলের ভেতর থেকে একটা বিরাট মাথা ভেসে উঠল বউটার কাছে, আর সঙ্গে-সঙ্গে গলা বাড়িয়ে খপ করে ধরল বউটার একটা পা। বউটা দু-হাত দিয়ে বাঁধের মাটি আঁকড়ে ধরে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করল বটে, কিন্তু কুমিরের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে কেন! কিছু দূরে তার একটা দশ-বার বছরের ননদ দাঁড়িয়েছিল। বৌদিকে কুমিরে নিয়ে যাচ্ছে দেখে মেয়েটা চিৎকার করতে-করতে ছুট লাগাল গাঁয়ের দিকে। কুমিরটা জল-জঙ্গলের মধ্য দিয়ে টানতে-টানতে বৌটাকে নিয়ে গেল নদীতে। মেয়েটার চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে আট-দশ মিনিটের মধ্যে বাঁধের ওপর জমে গেল বহু লোক। বাঁধের মাটিতে বউটার হাঁচড়-পাঁচড়ের দাগ দেখতে পেল সকলে, কিন্তু চার দিকে তাকিয়ে না বউটার, না কুমিরটার, কারো কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না আর। তিন-চার দিন বাদে দেখা গেল এক-মাইল দূরে, নদীটা যেখানে সপ্তমুখীতে পড়েছে, তার কাছে ভাসছে বউটার ফুলে ওঠা শরীর, আর তার পাশেই ভেসে রয়েছে কুমিরটা। শিকার বাগিয়ে নিয়েই কুমির সেটাকে জলের ভেতরে শরীরের চাপ দিয়ে ডুবিয়ে রাখে, যাতে সেটা বেশ পচে ওঠে। মাংস পচে নরম হলে পাঁউরুটি ছিঁড়ে খাবার মত কুমির মজাসে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খায় পচানো শিকারের মাংস।

নদী-খালে ভর্তি সুন্দরবনের আবাদি এলাকা। জল, জাল, আর ডিঙি নিয়েই সেদিককার লোকের কাজ কারবার। বউটাকে ধরার মাস খানেক পরে জগদ্দল নদীর একটা শাখার ধার থেকে আবার

একটা কুমির সতীশ প্রধান নামের এক বুড়োকেও টেনে নিয়ে গেল নদীতে। সতীশ নদীতে জাল দিয়ে মাছ ধরছিল। পাড়ের ওপর মাছ ছড়িয়ে দিলে সেগুলো কুড়িয়ে নিচ্ছিল তার এক নাতনী। নদীর ওপারের একটা জঙ্গলা জায়গায় বসে ছিল এই কুমীরটা। সতীশ কুমিরটাকে দেখতে না পেলেও কুমিরটা কিন্তু সতীশকে লক্ষ্য করেছিল ঠিক। শাখাটা চওড়া সেখানে এক'শ গজের মতো। এক সময় রাক্ষসটা বুড়োর অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে জলে নেমে এক ডুবে চলে এল নদীর এপারে। নদীর ধার থেকে দশ-পনর হাত ওপরে, নদীর দিকে পেছন ফিরে বুড়োটা তখন জাল থেকে মাছ ছাড়াচ্ছিল ; নাতনীটাও একমনে মাছ কুড়োতে ব্যস্ত। কুমীরটা পাড়ে উঠেই বুড়োটার পা কামড়ে ধরে তাকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল নদীর দিকে। কুমিরের মুখ থেকে আর বাঁচার আশা নেই বুঝতে পেরে বুড়োটা মাটিতে পড়ে গিয়েও তার নাতনীর উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলতে লাগল, "তোর ঠাম্মাকে কইবি, তার বুড়াকে কুমিরে লই গ্যালা। হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল!"—দেখে শুনে মনে হবে যেন আগে থেকেই পাকা ব্যবস্থা ছিল তাকে তখনই কুমিরের সঙ্গে যেতে হবে। তার কথাগুলো বলা শেষ হতে না হতেই কুমিরটা বুড়োটাকে টেনে নিয়ে ফেলল একেবারে নদীর ধারের জলকাদার মধ্যে।

বুড়াবুড়িতট, দাসপুর, এল-প্লট—এই সব এলাকায় যখন কুমিরের এই রকম অত্যাচার চলছে, চারদিকের লোকজন তখন কুমির বংশ কমানোর জন্য উঠে-পড়ে লাগল। এদের মধ্যে আবার সব থেকে উৎসাহী ছিল কয়ালের বাজারের সর্বেশ্বর বারুই। কয়ালের বাজার এল-প্লটের একটি গণ্ডগ্রাম। সর্বেশ্বরের চেহারা আর সাহস ছিল ভীমের মত। একবার সে একটা আসল সুন্দরবনী বাঘ মেরেছিল স্রেফ লাঠিপেটা করে। গাঁয়ে ঢুকে বাঁধের ওপর শুয়েছিল বাঘটা ; পেছন থেকে এসে সর্বেশ্বর হেঁতালের লাঠি দিয়ে এমন এক ঘা মেরেছিল বাঘের ঠ্যাঙে যে, ছাল ছাড়াবার পর দেখা গেল,

জানোয়ারটার ঠ্যাঙের কয়েক সের মাংস বনে গিয়েছে একেবারে চপের কিমা। তার এমন সাহস যে, শিকারীদের সঙ্গে জঙ্গলে গিয়ে দরকার পড়লে রাত-বিরাতেও গাছের মাচান থেকে নেমে বনের ভেতর দিয়েই হেঁটে চলে যেত দূর দূর গ্রামে। তার শরীরটা এখনকার মতো আড়াইমনী হবার আগে এক সময় সে রণপায় চেপে দু-ঘণ্টার পথ ভাঙতে পারত এক ঘণ্টায়। আশপাশের দশ-বিশ গাঁয়ের সব লোকই চিনত তাকে। সর্বেশ্বরের চার-বছরের ছেলেটাও বেড়ে উঠছিল বাবার মতই পালোয়ান আর ডানপিটে হয়ে। তার কাছাকাছি বয়সের যেসব ছেলে আসত তার সঙ্গে খেলা করতে, বোঝাপড়ার একটু এদিক-ওদিক হলেই, তাদের মেরে ধরে দূর করে দিত বাড়ী থেকে। তার দৌরাত্ম্যে তাদের বাড়ীতে কোন ছোট ছেলের আসার উপায় ছিল না। লোকজনের কাছে নিজের ছেলের উপদ্রবের কথা তুলে মাঝে মাঝেই দুঃখ করত সর্বেশ্বর। ভীমের বকরাক্ষসকে চ্যালেঞ্জ করার মতো সর্বেশ্বরই সব থেকে বেশি তোড়জোড় করে এগিয়ে এল কুমিরের মোকাবিলা করতে। কিন্তু কুমির এমনি বেকায়দার প্রাণী যে কামান বন্দুক, বোমা, যা-ই থাক না হাতে, জলের তলায় নিপাত্তা হয়ে থাকে বলে, তাকে খতম করা তো দূরের কথা, তার দিকে বন্দুকটা একবার তাগ করাও মুশকিল—কখন কোথায় কি ভাবে যে থাকবে, তার কোনই নিশ্চয়তা নেই। কোথাও মানুষের সামান্য সাড়া পেলেই টুপ করে নেমে পড়বে জলে। তার কান আর চোখ, দু-ই সমান তীক্ষ্ণ। আবার যেখানে-সেখানে গুলি লাগিয়েও মারা যায় না ; কেবল চোখ, গলা আর সামনের দু'খানা হাতের একটু পেছনে হার্ড নোজ বুলেটের ঘা লাগাতে পারলেই তাকে যমদুয়ার দেখাতে পারা যায় সহজে। জলের মানুষখেকো কুমির মারার চেয়ে বরং বনের মানুষখেকো বাঘ শিকার অনেক সহজ।

বিনা বন্দুকে দু'দুটো ভারী কুমির মেরেছিল সর্বেশ্বর বারুই। তার চেহারার মতো তার বুদ্ধিটাও ছিল অদ্ভুত। কামারকে দিয়ে

চারটে কুমিরমারা বড়শি তৈরী করাল সে। এক-একটা বড়শি দেখতে অনেকটা নৌকোর নোঙরের মতো, কিন্তু আকারে ছোট। এতে ছিল আট-দশ ইঞ্চি লম্বা একটা লোহার রড—তার এক ধারে ছিল একটা ছোট আংটা, আর একধারে ছিল তিনমুখী তিনটি বড় বড়শি-কাঁটা। একটা এক-ফুটের মতো লম্বা কলা গাছের ডুমোর ওপর একটা জ্যান্ত হাঁসকে বেঁধে দিয়ে, তার উপরে বড়শিটা এমনভাবে রাখা হল যাতে একটা কাঁটা থাকে হাঁসটার পেট আর গলার তলা দিয়ে আর দুটো কাঁটা একটু উঁচু হয়ে থাকে হাঁসের পিঠের দু'পাশে। বড়শিটাও তার দিয়ে ভাল করে বেঁধে দেওয়া হল কলার ডুমোর সঙ্গে। বড়শির পেছনের আংটার সঙ্গে বাঁধা হল পাঁচ-ছ হাত পাকানো তারের কাছি, আর এই তারের কাছির শেষের দিকটা বাঁধা হল একটা লম্বা পাটের কাছির সঙ্গে। নারকেলের কাছি কুমির দাঁত দিয়ে কেটে ফেলে, কিন্তু পাটের কাছি দাঁতে জড়িয়ে যায় বলে, কুমির পাটের কাছি কেটে পালিয়ে যেতে পারে না।

নদীর যে সব জায়গায় কুমিরের উপদ্রব ছিল বেশি, তেমন কয়েকটা জায়গা ঠিক করে নিয়ে প্রত্যেক জায়গায় একটা করে হাঁস-বড়শি বসান কলার ডুমো ভাসিয়ে দেওয়া হল। কাছিগুলো বেঁধে রাখা হল জায়গামতো একটা শক্ত গাছে। কলগুলো ভাসান হয়েছিল বিকেলের দিকে একটা ভাটার মুখে। নদীতে আর তার শাখায় জল তখন কানায় কানায়। বাঁধের যে-জায়গায় বউটাকে কুমিরে ধরেছিল, সর্বেশ্বর আর তার দু'জন শাগরেদ গিয়ে বসল তার কাছাকাছি একটু আড়ালে। নদীটা সেখান থেকে প্রায় দু'শ হাত দূরে। নদী আর বাঁধের মধ্যে ছিল নোনা জঙ্গল—গামা, বানী, ক্যাওড়া, গরাণ, হেঁতাল এইসব গাছের ছোট-বড় ঝোপঝাড়। এখানে-ওখানে দু-একটা বড় গাছও ছিল সেখানে। গাছগাছালির ফাঁকে-ফাঁকে হাঁসটা দেখা যাচ্ছিল পরিষ্কার। স্রোতের টানে সেটা একবার পাড়ে এসে ঠেকছিল, আবার কখনো বাতাসে সরে যাচ্ছিল নদীর কিছুটা ভেতরে। হাঁসটা

অস্বস্তিতে এক-একবার ডানা ঝটপটিয়ে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করছিল, আর নিজের সেই অসহায় অবস্থার জন্য প্যাঁক-প্যাঁক শব্দে প্রতিবাদ জানাচ্ছিল করুণভাবে। সর্বেশ্বর স্টিমারের সার্চলাইটের মতো সন্ধানী দৃষ্টিতে চারদিক লক্ষ্য করে দেখছিল কোন কুমির হাঁসের শব্দে বড়শির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কিনা। জোয়ারের জল হাঁস-কল ভাসাবার কিছুক্ষণ আগেই জঙ্গল থেকে নেমে গিয়েছিল। একসময় সর্বেশ্বর দেখতে পেল, হেলিকপ্টারের মতো বিশাল চেহারার কয়েকটা পক্ষিদানব, কাঁক, খুন্তেবক, আর হাড়গিলে, এদিক-সেদিক থেকে উড়ে এসে জলকাদার মধ্যে পড়ে খপাখপ গিলতে লাগল, জোয়ারের জলে ভেসে আসা মাছ কাঁকড়া পোকামাকড়। বছরের বিভিন্ন সময়ে জলা-জঙ্গলে এমন বড় বড় পাখি, নানা জাতের স্টর্ক, টীল, শরাল, সাচকা, জল-মুরগি, কাস্তেচরা, রাঙামুড়ি, লালশির প্রভৃতি নানা বর্ণের আর নানা চেহারার অসংখ্য দেশী-বিদেশী পাখি দেখে লাটের লোকেরা।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হল, তবু কোন মানুষখেকোর দেখা মিলল না। নদীর দিকটায় যখন আর নজর চলছিল না, সর্বেশ্বর তখন থেকে হাঁস-কলের কাছিটা ডান হাত দিয়ে ধরে রাখল, যাতে কাছির টানাটানি লক্ষ্য করে বুঝতে পারে বড়শিতে কুমির পড়েছে। ক্রমে অন্ধকার ঘনিয়ে এল জঙ্গলের ভেতরে-বাইরে। তখন শীতকাল, কিন্তু তবু আকাশ ছিল মেঘলা। জঙ্গলের ভেতরে উঁকি দিতে একটা তারাও ছিল না আকাশে। কেবল নীচের জলকাদার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা সামুদ্রিক প্রাণীকণার পচনজনিত একটা ম্লান আলো ছাড়া বাকি সব দিক গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা। অন্ধকারের ভেতর দিয়ে সামনের ঝোপঝাড়কে মনে হচ্ছিল যেন মূর্তিমান সব ভূত-প্রেত। রাত কিছুটা বাড়তে আশপাশ থেকে ভেসে আসতে লাগল সাপেধরা ব্যাঙের কোঁকানোর আঁ-আঁ-ক, আঁ-আঁ-ক আর্তরব। বড় গাছের উঁচুতে জোরে জোরে একটা বুক কাঁপান বিকট শব্দ হচ্ছিল

'টক-খক' 'টক-খক'। বাইরের কেউ সে-শব্দে ভয় পেত নিশ্চয়ই, কিন্তু সেদিকের লোকেরা জানে সুন্দরবনের গাছে-গাছে তক্ষক-সাপ অমনি শব্দ করে।

রাত ন'টা সাড়ে-ন'টায় দলটা তাদের সামনের দিকের জলকাদার মধ্যে শুনতে পেল একটা থপ-থপ শব্দ। সর্বেশ্বরের মনের মধ্যে বিদ্যুৎ চমকের মত হঠাৎ একটা আশঙ্কা উঁকি দিয়ে গেল নিমেষের জন্য—অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে কোন কুমির রাক্ষস তো সরাসরি এগিয়ে আসছে না তাদের দিকেই! একটা তিন সেলের টর্চ ছিল তাদের হাতে, কিন্তু সেটা জ্বালতে ভরসা পাচ্ছিল না তারা। যদি কুমির না হয়, তবে আধ মাইলের মধ্যে থাকলেও টর্চের তীব্র আলো চোখে পড়লে, রাক্ষসটা আর সহজে ভিড়বে না সেদিকে। কিন্তু টর্চ না জ্বেলেও তাদের উপায় ছিল না। টর্চ ফেলে চারদিক ভাল করে দেখতে চেষ্টা করল সর্বেশ্বর, কিন্তু গাছগাছালির জন্য কিছুই আর স্পষ্ট বোঝা গেল না। মাছখেকো ভোঁদড়, না ভুঁড়ো শেয়াল, না সত্যি কোন ধূসর রঙা নোনা জলের কুমির দানব, আলো দেখে ভড়কে গিয়ে গাছের আড়ালে কোথাও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল কি-না, সকলে কিছুটা খোঁজাখুঁজি করেও তা বুঝতে পারল না। সেখানে আর তখন বসে থেকে লাভ নেই বুঝে রাত্রির মতো তারা চলে গেল গাঁয়ের ভেতরে।

ভোর হতে-না-হতে অনেক লোকের কথাবার্তায় সর্বেশ্বরের ঘুম ভেঙে গেল। ঘরের ভেতরে থেকেই সর্বেশ্বর বুঝতে পারল এই গাঁয়ের ধারের কলে একটা কুমির আটকা পড়েছে, কে একজন এসে খবর দিয়েছে, বড়শির জায়গাটার নদীর জল তোলপাড় হচ্ছে। নদীর ধারে এসে সর্বেশ্বর দেখতে পেল, সত্যি একটা কুমিরই তার এইদিকের বড়শিটা গিলে ফেলেছে। সেটা এক-একবার জল তোলপাড় করছে, আবার কিছুক্ষণ স্থির হয়ে থাকছে; কখনো ছুটে আসছে পাড়ের দিকে। কখনো দৌড়

লাগাচ্ছে নদীর ভেতরের দিকে। কুমিরটা কখন যে আটকা পড়েছিল তা বোঝা গেল না, তবে তখনো বেশ তেজের সঙ্গে চিৎ হয়ে, উপুড় হয়ে অনেক খেল দেখাচ্ছিল ছাড়া পাবার জন্য। কুমিরটা যত বেশি উথালি-পাথালি করছিল, কাঁটাগুলো তত বেশি জোরে বসে যাচ্ছিল তার গলার ভেতরে। রাক্ষসটার জারিজুরি কিছুটা কমলে সর্বেশ্বর সাবধানে কাছি টেনে টেনে তাকে তুলে নিয়ে এল চড়ার ওপরের জঙ্গলের ভেতরে। কুমিরটা প্রথমে আসতে বেশ নারাজ ছিল, দাপাদাপি করে আপত্তি জানাচ্ছিল খুব ; কিন্তু গলার কাঁটায় টান পড়তেই সুড়-সুড় করে চলে এল ওপরে। দেখতে দেখতে আশপাশের গ্রামের লোক ভেঙে পড়ল নদীর পাড়ে। যে বউটাকে কুমিরে খেয়েছে, তার ননদও এসেছিল মজা দেখতে। একটু রঙ্গ করার জন্য সর্বেশ্বর মেয়েটিকে কাছে ডেকে এনে অনেক বলে কয়ে কুমিরের কাছিটা ধরিয়ে দিল তার হাতে। মেয়েটা কাছি ধরে একটু টান দিতেই কুমিরটা ভাল ছেলের মতো তার দিকে কিছুটা এগিয়ে গেল বটে, কিন্তু তারপর আবার কাছিতে টান পড়তেই শুরু করল ভীষণ দাপাদাপি ছুটোছুটি। কুমিরটার রকম-সকম দেখে আশপাশের লোকজন ছিটকে সরে গেল দূরে। ভয় পেয়ে মেয়েটাও কুমিরের কাছিটা ছেড়ে দিয়ে চিৎকার করতে করতে তীরের বেগে ছুট লাগাল বাঁধের দিকে। কুমিরটাকে দাপাদাপি করতে দেখে কয়েকজন জোয়ান-লোক একটু এগিয়ে গিয়ে বড় বড় বাঁশ দিয়ে চপাচপ এলোধাবাড়ি পেটাতে লাগল রাক্ষসটার ঘাড়ে-পিঠে। কিন্তু তার ব্যাপার-স্যাপার দেখে মনে হল, অত মার খেয়েও সে একটুও কাবু হয় নি। কাবু হবে কি ভাবে! নোনাজলের কুমিরের পিঠের ওপর গণ্ডারের শিংয়ের ধরনের কঠিন হাড়-চামড়ার যেরকম সারি-সারি শক্ত পাত থাকে, তা থেকে সময় সময় বন্দুকের গুলিও ঠিকরে যায়, বাঁশের বাড়ি তো তার পিঠে একরকম সুড়সুড়ি! পাছে ল্যাজের বাড়ি মেরে খতম করে দেয়, সেই ভয়ে কেউ তার বেশি কাছেও

ভিড়তে সাহস করছিল না। গলায় কাঁটা বিঁধে থাকলেও কিন্তু রাক্ষসটার কান আর চোখ ছিল সব দিকে, আর তখনো তার শরীরে শক্তি ছিল যথেষ্ট। অবশেষে দু'পাশ থেকে লম্বা লম্বা বাঁশ দিয়ে কুমিরটার শরীরের কয়েক জায়গায় শক্ত করে চেপে ধরে, তার পেছনের দিকের কতকগুলো চ্যাপটা কাঁটার মধ্য দিয়ে ল্যাজটা কোন রকমে বেঁধে ফেলা হল একটা শক্ত দড়ি দিয়ে। চারজন জোয়ান লোক সেই দড়ি টেনে ধরতে বন্ধ হল তার ল্যাজ খেলানো। গলার কাছি আর ল্যাজের দড়ি দু'দিক থেকে টেনে ধরে সকলে এবার রাক্ষসটাকে বাঁশপেটা করতে লাগল পাইকারী হারে। এক ঘণ্টার মতো নানা ভাবে নিগ্রহ ভোগের পর সাঙ্গ হল তার ভবলীলা।

বার বার গুঁতোগুঁতি করেও যখন সকলে দেখল যে কুমিরটা আর নড়বে না কোন দিন, তখন মেপে দেখা গেল সেটা পুরো আট হাত, অর্থাৎ বার ফুট লম্বা ছাই রঙের একটা বনেদী সুন্দরবনী কুমির-প্রবর। কিন্তু সেটাই যে বৌটা বা বুড়োটাকে খেয়েছিল, তার কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না, কারণ নারী-পুরুষ কারো চুলই ছিল না তার পেটের বিশাল গহ্বরে। তবু রাক্ষস বংশের একটাকেও যমের বাড়ী পাঠাতে পারায় সর্বেশ্বরকে ঘিরে আনন্দে নাচতে লাগল গাঁয়ের সব লোক।

ব্যাঘ্রপুরীতে ভগবান



গত ত্রিশ-বছরের মধ্যে এমন কিছু দিন ছিল যে-সময়ে দেশের কোন কোন বনের বাঘের সংখ্যা কমানোর জন্য সরকারকে রাইফেলধারী বিশেষ বাহিনী নামাতে হয়েছিল। সুন্দরবনের বৈঠাভাঙা-জঙ্গলের

বাঘগুলোও তখন হয়ে উঠেছিল ভীষণ বেয়াড়া। জঙ্গলের ধারে-কাছে যখন গরু আর মানুষ একের-পর-এক বাঘের পেটে যাচ্ছে, অর্জুন তখন বসে আছে গ্রামে—মাঝে মাঝে সমুদ্রের চড়ায় বন্দুক দিয়ে হাঁস-শরাল শিকার করছে, আর খালে-পুকুরে মাছ ধরছে জাল-বড়শি দিয়ে। বাসন্তী পূজার যখন আর মাত্র চারদিন বাকি, সেই সময় মৈপিঠ কাছারি থেকে লাটদার তুষারের একখানা চিঠি পেল অর্জুন—ফাল্গুন মাসে ভগবানকে বাঘে ধরেছিল ; এর মধ্যে অনেক মানুষও গিয়েছে বাঘের পেটে। অসভ্য জানোয়ারগুলোকে গরম সীসের গুলি খাইয়ে কিছু শিক্ষা দিতে অর্জুন যেন শীগ্‌গির তার বন্দুক নিয়ে মৈপিঠে ছুটে আসে। একজন অভিজাত লাটদার আর দুঁদে শিকারী হিসাবে অর্জুন ডাকসাইটে লোক।

ভগবান মৈপিঠের লোক। অনেকবার অর্জুনের সঙ্গে পাশ-শিকারীর কাজ করেছে সে। ভগবানকে বাঘে ধরার খবর পেয়ে বাঘ ঠেঙাতে অর্জুন ছুটল মৈপিঠে। সেখানে পৌঁছে তুষারের কাছে সব শুনল সে। বৈঠাভাঙা জঙ্গলে বাঘে ধরলে বীরের মতো লড়েছিল ভগবান। মাসখানেক আগে ভর-দুপুরে কাঙাল, নিতাই, গোবরা আর সে নদীর ওপারের জঙ্গলে গিয়েছিল কিছু কাঠ কেটে আনতে। ভগবান একটা গরাণ-গাছে কুড়ুলের কয়েকটা কোপ মারতেই দেখতে পায় একটা ভারী-সারী সুঁদরী বাঘ দশ-পনর হাত দূরের একটা ঝোপের ভেতর থেকে তাকেই লক্ষ্য করছে। বাঘের সঙ্গে চোখাচোখি হবার কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে শয়তানটা ছুটে এসে তার বাঁ-কাঁধ কামড়ে ধরে। ভগবান বাঁ-হাত দিয়ে গরাণ-গাছটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরে ডান হাত দিয়ে কুড়ুলের কোপ ঝাড়তে থাকে বাঘের পিঠে। তার চিৎকার চেঁচামেচি শুনে কাঙালরা ছুটে এসে বাঘটার ঘাড়ে পর পর কয়েকটা কোপ বসাতে সেটা ঘায়েল হয়ে পড়ে যায় মাটিতে। ভগবানও রক্তে স্নান করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। কিন্তু মা-বিশালাক্ষীর কৃপায় সে-যাত্রায় প্রাণে বেঁচে গিয়েছে সে।

কাঙাল-ভগবান-তুষার—সকলেই পুজোর মধ্যেই জঙ্গলে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল। অর্জুন বোঝাতে চেষ্টা করে, বাঘ দেবী-বিশালাক্ষীর বাহন—এই পুজোর মধ্যে জঙ্গলে গেলে দেবী অসন্তুষ্ট হবেন। কিন্তু কাঙালরা বলতে থাকে, "এর পর পূর্ণিমাতে কোটাল আসবে। তখন জঙ্গলের অনেক জায়গা ডুবে যাবে, বাঘ পালিয়ে যাবে দূরে, উঁচু বালিয়াড়ির জঙ্গলে, তখন আর কিছুই করা যাবে না। কাল নবমী। এখনই সব থেকে সুবিধের সময়—রাত একটা দুটো পর্যন্ত চাঁদ পাওয়া যাবে।"

অবশেষে মনে খুঁতখুঁতি নিয়েও নবমীর দিনই জঙ্গলে যেতে রাজী হল অর্জুন। গাঁয়ের পুবেই ঠাকুরান নদী। তার ওপারেই জঙ্গল। একটা ডিঙিতে শিকারের সাজ-সরঞ্জাম, আর কিছু মুড়ি-গুড়-জল নিয়ে দুপুরের আগেই বেরিয়ে পড়ল অর্জুন, তুষার, কাঙাল, আর ভগবান। আধ-ঘণ্টার মধ্যে নদী পেরিয়ে তারা পৌঁছে গেল বৈঠাভাঙা জঙ্গলের ধারে। একটা খালের মধ্য দিয়ে ডিঙিটা সিকি-মাইলটাক বনের ভেতরের দিকে নিয়ে গিয়ে, চারদিক ভাল করে লক্ষ্য করে, জলকাদার মধ্যেই নেমে পড়ল সকলে। সুন্দরবনের সব নদী-খালেই কম-বেশি কুমিরের ভয় আছে। জলে কুমির ডাঙায় বাঘ, একেবারে সেই-অবস্থা! পরনে অর্জুন আর তুষারের খাকি হাফপ্যান্ট, আর দু'জনের পাঁচ-হাতি গামছা, পা কিন্তু সকলেরই খালি—খাল-খাড়ির জন্য সুন্দরবনের ভেতরে জুতো-পায়ে চলা যায় না। ওপরে উঠে এসে দলটা গরাণ-বানী-সুঁদরীর মত গাছ, আর বখড়া-কানকুলের ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল বনের আরো গভীরে। এক-জায়গায় একটু থেমে ভগবান আঙুল দিয়ে দেখাল ফাল্গুন মাসে কোথায় তাকে বাঘে ধরেছিল। মিনিট-পনর চলার পর অর্জুনরা এসে পড়ল একটা ধলের মধ্যে—ধল হল বনের মধ্যে বড়-বড় ফাঁকা জায়গা! এই ধলটা ছিল বানী-গাছের ছোট ছোট চারা ভর্তি কয়েক'শ বিঘার একটা বিরাট ফাঁকা জায়গা। সময় সময় ধলটা বড়

জোয়ারের নোনা জলে ভেসে যায় বলে ধলের মাটিতে জমে ছিল একটা পুরু নুনের স্তর। ধলের ওপাশের জঙ্গলটাই ছিল বড়। ধলের ওপারের জঙ্গলে মাচান তৈরী করবে মনে করে এবার তারা চলতে লাগল ধলের মধ্য দিয়ে। কিন্তু নুনের জন্য ধলের মাটি এমনি তেতে উঠেছিল যে, তখন তার ওপর দিয়ে খালি-পায়ে যায় কার সাধ্যি! পায়ের তলা যেন পুড়ে যেতে লাগল। পাঁচ-সাত মিনিট কোন রকমে হেঁটে চলার পর ধলটা তাড়াতাড়ি পেরোবার জন্যে অর্জুনরা শেষে দৌড়াতে লাগল। মিনিট-দশেক সেই ভাবে ছুটতে ছুটতে ধলটা পার হয়ে ওরা এসে পড়ল বনের ভেতরের একটা খালের পাড়ে। কিন্তু সেখানে পৌঁছেই তাদের সঙ্গে সঙ্গে আবার ঝট করে পিছু হঠতে হল। কথায় বলে গাছে না উঠতেই এক কাঁদি, ঠিক তেমনি ব্যাপার! জঙ্গলের ভেতরে মাইল-খানেক ঢুকতে না ঢুকতেই দু-দুটো সাক্ষাৎ যমের সঙ্গে হঠাৎ একেবারে মুখোমুখি চোখাচোখি! ঠিক আগের মুহূর্তেও তারা ভাবতে পারেনি যে, এই ভাবে হঠাৎ তাদের এক জোড়া দুশমনের সামনা-সামনি হতে হবে। তারা নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেখে খালের জলের একেবারে ধারে কাদার মধ্যে শুয়ে আছে একজোড়া মাঝারি সাইজের বাঘ, একেবারে বনেদী সুন্দরবনী জানোয়ার! পনর-কুড়ি গজের মধ্যে বাঘ পেয়েও কিন্তু তারা গুলি করতে পারল না সাহস করে। সেখান থেকে গুলি করলে বাঘ-বাঘিনী তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত সন্দেহ নেই। ব্যাঘ্র-যুগল তাদের সাড়া পেয়েই কেন যেন ভদ্র সন্তানের মতো খালের ধারে ধারে সরে গিয়ে জঙ্গলে গা ঢাকা দিল—বোধ হয় গরমে ক্লান্ত বলেই তখন আর তারা কোন ঝামেলার মধ্যে যেতে চায়নি গায়ে পড়ে। পেছনের দিকে সরে যেতে যেতে অর্জুন ফিসফিসিয়ে বলল, "মনে হচ্ছে এদিকে বাঘের আনাগোনা আছে। যদি এখানে কেউ একটা গাছ বেছে নিয়ে মাচান করে বসে, তাহলে রাতের দিকে একটা মানুষখেকোকে খতম করা সম্ভব

হতে পারে। সব থেকে ভাল হয় খালের ওপারে মাচা তৈরী করতে পারলে।”

বড় জঙ্গলের দিকটায় একটা মাচান তৈরী করবে বলে খালের ধার দিয়ে একটা তাটের খোঁজে এগিয়ে যেতে লাগল দলটা। তাট হচ্ছে খালের মাঝের খানিকটা ভরে ওঠা চড়াজমি। আধ-মাইলটাক গিয়ে ওরা পেয়েও গেল একটা লম্বা চওড়া তাট। এই তাটের ওপর দিয়েই বনের জন্তু জানোয়ার খালের একদিকের জঙ্গল থেকে আর একদিকের জঙ্গলে যাতায়াত করে। তাটটা পার হয়ে অর্জুনরা চলে এল যেখানে তারা দুটো বাঘ দেখেছিল তার ঠিক উল্টোদিকে। এখানে একটা গরাণ গাছের উঁচুতে মাচান তৈরী করে, তাতে বসল তুষার আর কাঙাল। অর্জুন ওদের বিশেষ করে বলে দিল জল পিপাসা পেলে তারা যেন গরাণের কুঁড়িপাতা চিবিয়ে আর অল্প স্বল্প জল খেয়ে পিপাসা দমন করে। গরাণের কুঁড়িপাতা একটু কষাটে বোধ হলেও, পিপাসা কমায়। গুলি চালাবার পরে উত্তেজনার জন্যে জল দরকার হয় বেশি। কাজেই ঘটির জল যেন তারা আগেই শেষ করে না ফেলে।

তুষার আর কাঙালকে মাচানে তুলে দিয়ে অর্জুন আর ভগবান ফিরে চলল তাটের দিকে। তাটের ওপর দিয়ে বাঘও যাতায়াত করে বলে তারা ঠিক করল তাটেরই একধারে একটা মাচানে বসবে। তাটের কাছাকাছি একটু ঘোরাঘুরি করতেই তারা ছোট-জঙ্গলের দিকটায় দেখতে পেল একটা ছ-সাত ফুট উঁচু পুরান মাচা পড়ে আছে ভাঙা অবস্থায়। তারি চারদিকে ছাড়া ছাড়া ভাবে দাঁড়িয়ে আছে বানী—গরাণ—গর্জন-কালিআইল গাছ, আর নানা ধরনের ঝোপঝাড়। কোথাও কোথাও রয়েছে কোমর-সমান-উঁচু জুনঘাস। মাচানটা দেখে অর্জুন বলল, “এখন নতুন মাচা তৈরী করতে সময় লাগবে। কে কখন অন্যমনস্ক হব, আর সেই সুযোগে কোন মানুষখেকো আমাদের কাউকে ধরে নিয়ে গিয়ে ফলার করবে—না, তা হতে

দেওয়া যাবে না। নীচু হলেও ঠিকঠাক করে নিয়ে এটাতেই বসা যাক।”

মাচানটা বাঁধাছাঁদা করে, কিছু ডালপালা দিয়ে ঘিরে, অর্জুনরা যখন মাচানে বসল, তখন বিকেল পাঁচটা। মাচানের সামনের দিক ছিল তাটের ওপারের বড় জঙ্গলের দিকটায়। তার দু'পাশ আর সামনের দিকটা ছিল ডালপালা দিয়ে ঘেরা, কিন্তু মাথার ওপরটা আর পেছনের দিকটা ছিল ফাঁকা। মাচাতে বসার অল্পক্ষণের মধ্যে চারদিক হয়ে এল নিস্তব্ধ আর থমথমে। কেবল এদিকে সেদিকে বনের আড়ালে শুকনো পাতার ওপর দিয়ে জন্তু-জানোয়ার চলে যাবার খচমচ শব্দ হচ্ছিল মাঝে মাঝে। সন্ধ্যার একটু আগে মাচানের ডালপালার ফাঁক দিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে অর্জুনদের চোখ তো ছানাবড়া। সত্তর-আশি গজ দূরে তারা দেখতে পেল একটা মস্ত বড় কাদামাখা জন্তু তাটের ওপারের এক কোণার দুটো বড় কালিআইল গাছের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসছে এ-পারের জঙ্গলের দিকে! একটু ভালমতো লক্ষ্য করে অর্জুন বুঝতে পারল, সেটা দক্ষিণরায়ের এক খাস চ্যালা—একটা সুন্দরবনী কেঁদো বাঘ। বাঘটা খালে নেমেছিল, বোধ হয় গরমের জন্যে, নয়তো মাছ খেতে। অর্জুন যখন কাদামাখা বাঘটাকে লক্ষ্য করছিল, ভগবান ইশারায় দেখাল অর্জুনের বাঁ দিকেও রয়েছে আর একটা বাঘ, তবে সামনেরটা থেকে ছোট। এটা ছিল মাচা থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে। কাদামাখা বাঘটা যখন দূর দিয়ে মাচানের ডান দিকের একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকছে, অর্জুন তখন কাছের বাঘটার ঘাড় তাগ করে গুলি চালাল। গুলি লাগলে বাঘটা যেখানে ছিল, সেখানেই বসে যেত, কিন্তু গুলিটা বাঘটার ঘাড় ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। একটা হুঙ্কার ছেড়ে লাফ দিয়ে কাছের জঙ্গলে ঢুকে গেল বাঘটা। গুলিটা ফসকে যেতে ভীষণ আপসোস করতে লাগল অর্জুন—যদি বুক লক্ষ্য করে গুলি করত, তাহলে তার কণ্ট্রাকটাইল সলিড গুলি বাঘটার লম্বা চওড়া ফুসফুসটা ছিঁড়েভিঁড়ে

ফেলত সন্দেহ নেই। একটু দেরীতে হলেও বাঘটা তাতে মরত ঠিকই। পাশে বসা ভগবানকে ফিসফিসিয়ে বলল, "পুজোর দিন, দেবীর বাহনকে মারার চেষ্টা বৃথা। চার চারটে বাঘ দেখলাম। কাছে পেয়েও কিন্তু একটাও মারতে পারলাম না। হয়ত এর মধ্যেই আছে কোনো মানুষখেকো।"

ছোট বাঘটা পালিয়ে যেতে তাদের খেয়াল হল কাদামাখা জানোয়ারটা কাছেই রয়েছে কোথাও। তাড়াতাড়ি একটা চাদর দিয়ে মাচানের পেছনের ফাঁকা দিকটা ঢেকে দিল তারা। অবশ্য একটা পাঁচ-ছ'মনি বাঘ যে কোন দিক থেকে এরকম একটা খেলো মাচানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে আর রক্ষা থাকে না, তবু বলতে হবে মাচানটা ছিল এই সব দানবদের ধোঁকা দেবার পক্ষে একটা ভাল ব্যবস্থা—যদি সব সময় সজাগ থাকা যায়। কিন্তু একটু সুযোগ পেলেই বাঘ শিকারীদের মাচানের ভেতর থেকেই তুলে নিয়ে যাবে।

সন্ধ্যার মুখেই পূর্ব দিগন্তে উঁকি দিল নবমীর চাঁদ। চিতাবাঘের হলুদের ওপর কালো ছোপ ছোপ দাগের মতো বনভূমিতে ধীরে ধীরে ফুটে উঠল জ্যোৎস্না আর রানী-গরাণের কালো ছায়ার আলো-আঁধারি রূপ। সন্ধ্যার পর থেকেই খালের মধ্য দিয়ে গাছের ফাঁকে ফাঁকে মাচানের দিকে আসতে লাগল দিব্বি ঠাণ্ডা দক্ষিণা হাওয়া। এক সময় কোচড় থেকে মুড়ি বের করে খেতে লাগল ভগবান। অর্জুনকেও সাধাসাধি করল, কিন্তু তার মন মেজাজ খারাপ বলে সে খেলনা মোটেই। সন্ধ্যার কিছু পরেই অর্জুনরা টের পেল মাচানের পেছনে একটা জন্তু এসেছে। গাছগাছালির খসখস আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছিল সেটা বসে আছে পনর কুড়ি গজের মধ্যে। দেড় দু'ঘণ্টা ধরে একই জায়গায় নড়াচড়া করছিল জন্তুটা। অর্জুনদের বুঝতে বাকি থাকে না সেটা কি। হরিণ, বরা ওরকম ধৈর্য ধরে একই জায়গায় বসে থাকে না কখনো। শিকার ধরতে বাঘই কেবল ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই জায়গায় ওত পেতে বসে থাকে। জন্তুটা সেখানে থাকতেই

তাটের দু'পার থেকেই মাঝে মাঝে ভেসে আসছিল বাঘের নানা রকম আওয়াজ। ওরা বোধ হয় এর মধ্যে টের পেয়েছিল যে জঙ্গলে শিকারী এসেছে। এক সময় মৈপিঠের বাসন্তী মণ্ডপে শুরু হল নবমীর আরতি। অর্জুনরা শুনতে পেল ঢাকের বাজনা আর ঘণ্টাধ্বনি। হঠাৎ অর্জুনের বুকের ঢিবঢিবানি বেড়ে গেল। সেই মুহূর্তে তার বেশি করে মনে হতে লাগল বাসন্তী নবমীর দিন দেবীর বাহনকে নিধন করতে আসাটা মোটেই উচিত হয়নি। ভালয় ভালয় এখন প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারলে হয়। দু'হাত জোড় করে মৈপিঠের দেবীর উদ্দেশে প্রণাম জানাল অর্জুন। ওদিকে বাঘটা বোধ হয় অর্জুনদের মাচানের পেছনে বসে ভাবছিল মাচাটা একটা বাঘধরা খাঁচা, মানুষ ধরতে তার ভেতরে গেলে নিজেই ধরা পড়ে যাবে। তার থেকে বাবা একটু দূরেই বসে থাকা যাক, যদি খাঁচা থেকে কেউ বেরোয়, তখন তাকে দিয়ে বরং ডিনার সারা যাবে। কিন্তু বহুক্ষণ বসে থেকেও যখন দেখল খাঁচা থেকে কেউ-ই বেরোলো না, জন্তুটা তখন আপনা থেকেই সরে পড়ল হতাশ হয়ে।

চাঁদ যখন ডুবে গেল, রাত তখন দেড়টা কি দুটো। ক্লান্তিতে অর্জুন আর বসে থাকতে পারছিল না। ক্ল্যাম্প দিয়ে টর্চটা বন্দুকের সঙ্গে এঁটে নিয়ে সেটা বাঁ দিকে রেখে অর্জুন একটু কাত হল শরীরের অবসাদ কমাতে। ভগবান বসেছিল তার ডানদিকে। ইশারা ইঙ্গিতে তাকে বলল, "তুই একটু জেগে বসে থাক, সামনে কিছু এলে ঠেলা দিবি।"

কাত হয়ে পড়ে থাকতে থাকতেই অর্জুন টের পেল ভগবান আর এক দফা মুড়ি খাচ্ছে। তার মুড়ি চিবানর মুড় মুড় শুনতে শুনতেই ঘুমিয়ে পড়ল অর্জুন। ওপর থেকে হিম পড়ছে বুঝতে পেরে এক সময় ভগবান একটা গামছা জড়িয়ে নিল মাথায়—সুন্দরবনের বাতাস থাকে সব সময় ভিজে। অর্জুন সেই ভাবে কতক্ষণ ঘুমিয়েছে তার খেয়াল নেই, হঠাৎ ভগবানের গুঁতোনিতে তার ঘুম ছুটে গেল।

ভগবান তার মাথার দু'দিকে দু'হাতের তর্জনী খাড়া করে বোঝাতে চাইল মাচানের সামনে হরিণ এসেছে। অর্জুন ভগবানের মাথাটা সরিয়ে একটা ফুকরের মধ্য দিয়ে সামনের দিকে তাকাতেই দেখতে পেল মাচানের দশ-গজের মধ্যে একটা অস্পষ্ট লম্বা ছায়া। আকাশের তারা আর ভাটের ফসফোরাস মেশানো মাটির একটা ম্লান আলোর জন্যে তৈরী হয়েছিল ছায়াটা, সেটাকে ভগবান মনে করেছিল হরিণের ছায়া। রাত্রির অন্ধকারে সুন্দরবনের অনেক জঙ্গলেই, বিশেষ করে যে সব জায়গায় জোয়ার ভাটা খেলে, দেখা যায় অমন ভৌতিক আলো। অর্জুন ছায়াটা দেখেই বুঝতে পারল মাচানের সামনে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি হরিণ নন, হরিণের ছায়া অমন লম্বা ধরনের হয় না। আসলে সেটা একটা হরিণের যম, বিরাট বাঘ! মাচানের ওপর দিয়ে ভগবানের গামছাটা দেখতে পেয়েই এগিয়ে এসেছিল তাকে রাতারাতি বৈকুণ্ঠে পার করবে বলে। একটা চমৎকার রথে তো সে প্রস্তুত হয়ে বসেই ছিল, আর একটু সময় দিলেই ব্যাঘ্রপুঙ্গব ভগবানকে নির্ঘাত বয়ে নিয়ে যেত সরাসরি বিষ্ণু-লোকে। অর্জুন তাড়াতাড়ি বাঁ-হাতে বন্দুকটা নিয়ে ডান হাত দিয়ে ভগবানের ঘাড় ধরে তাকে এক রকম জোর করেই নিজের পেছনের দিকে শুইয়ে দিল, তারপর দুহাতে বন্দুকটা ধরে নলের ডগাটা একটু বের করে দিল একটা ফুকরের বাইরে। বাঘটা দাঁড়িয়েছিল মাচানের দিকে মুখ করে, হঠাৎ তার ডান দিকের জঙ্গলে আর কিসের দিকে যেন মনোযোগ পড়তে একটু ঘুরে দাঁড়াল। ব্যাপারটা স্পষ্ট মালুম না হলেও, সেই মুহূর্তেই টর্চ জ্বেলে গুলি চালাল অর্জুন। গুলি খেয়ে জানোয়ারটা একটা প্রকাণ্ড লাফ ঝেড়ে প্রচণ্ড রকম গর্জন করতে করতে ঢুকে গেল ভাটের ওপারের বড় জঙ্গলের ভেতরে। সেদিকে গিয়েও সেটা গর্জাতে লাগল কয়েক ঘণ্টা ধরে। অর্জুন বুঝল মারটা মোক্ষম ধরনের হয়েছে। গুলির শব্দে আর ঘায়েল বাঘটার গর্জনে চমকে উঠে বনের সব জন্তু-জানোয়ার চিৎকার

চেঁচামেচি করতে করতে ছুটে গিয়ে লুকাল বনের গভীরে। বাঘের গর্জন বন্ধ হতে বনের ভেতরটা হয়ে পড়ল একেবারে স্তব্ধ। বাকি রাতটা অর্জুনদের কাটল নিরুপদ্রবেই।

ভোর হতে তুষার আর কাঙাল এসে হাজির হল অর্জুনের মাচানের কাছে। অর্জুনরাও তখন মাচানের বাইরে দাঁড়িয়ে। তুষার প্রশ্ন করল,

"তোমরা বাঘ মারলে নাকি দাদা, গর্জন শুনলাম যে ?"

অর্জুন বলল, "মড়িটা না পেলে বলি কি করে ? তোমাদের কাছে বাঘ আসে নি ?"

"বাঘ আসে নি, তবে প্রথম রাতে ঘোঁত ঘোঁত আওয়াজ পেয়েছিলাম ; সেটা একটা শুয়োর হবে। বাঘের সাড়া পাইনি।" বলল তুষার।

বাঘটা মরেছে কি-না, সেটা পাওয়া যায় কি-না, খুঁজে দেখার জন্যে দুটো বন্দুক উঁচিয়ে দলটা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল তাটের ওপরের জঙ্গলের ভেতরে। এগাছ-সেগাছের মধ্য দিয়ে পঞ্চাশ গজের মত গিয়ে তারা দেখতে পেল সেখানকার গাছগাছালি দুমড়ানো মুচড়ানো, আর রক্তে মাখামাখি, কিন্তু বাঘ নেই সেখানে। রক্তের দাগ আর গাছগাছড়ার অবস্থা দেখতে দেখতে এগিয়ে যেতে লাগল দলটা। সকলের মনেই ভয়, এই বুঝি আহত দানবটা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আরো চল্লিশ গজের মতো এগিয়ে গিয়ে তারা দেখতে পেল এক জায়গায় ভনভন করছে নীল মাছি। ভয়ে ভয়ে কয়েকটা মাটির দলা সেই দিকে ছুড়ে মেরেও যখন দেখা গেল সেদিক থেকে কোন সাড়া শব্দ এল না, তখন অর্জুনরা সাহস করে এগিয়ে গেল আরো দশ পনর হাত। এবার তারা স্পষ্ট দেখতে পেল একটা পাঁচ-ছ'মনি বাঘ মরে পড়ে আছে কতকগুলো আগাছার মধ্যে ; তার চারপাশে রয়েছে আর একটা বাঘের পায়ের দাগ—বোধ হয় মরা বাঘটার কোন সাথীর। একটু লক্ষ্য করতেই বোঝা গেল গুলিটা

জানোয়ারটার ছু'দিকের ফুসফুসই ভেদ করেছে। অর্জুন আস্তে আস্তে বলল, "ব্যাটা নিশ্চয়ই মানুষ খেকো ; ভগবানকেও মাচান থেকে তুলে নিয়ে ভোজ সারতে চেয়েছিল শয়তানটা।"

ব্যাঘ্রপুরীতে আর বেশিক্ষণ থাকা ঠিক নয় ভেবে দলটা তাড়াতাড়ি ফিরে গেল ডিঙায়। মৈপিঠের বাসন্তী মণ্ডপে তখন একটানা বেজে চলেছে বিসর্জনের বাজনা। অর্জুনের জন্যে শেষ পর্যন্ত ভগবানের আর বৈকুণ্ঠে যাওয়া হলই না।

শঙ্খচূড়ের কবলে



সাপের ভয় যে মানুষের মনকে কি রকম বিকার-গ্রস্ত করতে পারে, শশধর তা নিজের জীবনেই বুঝতে পেরেছিল ভাল করে।

ঘটনাটি ঘটবার পর মাসখানেক দু'চোখের পাতা একেবারেই বন্ধ করতে পারেনি সে। সামান্য তন্দ্রার মধ্যেও সে সাপের স্বপ্ন দেখে চিৎকার করে উঠত। দিনের বেলাতেও মাঝে-মাঝে তার চোখের সামানে ভেসে উঠত সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা। কি দিনে, কি রাতে, সে সময়ে তার মনে শান্তি ছিল না মোটেই। তাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে, "তোমার জীবনের সব থেকে স্মরণীয় ঘটনা কি?"—সে সঙ্গে সঙ্গে বলে, "একটা অহিরাজ শঙ্খচূড়ের আট ফুট উঁচু ফণার তলা থেকে বেঁচে আসার ঘটনা"। বিরাট এক ফন্দিবাজ হরিণ-খেকো অজগরকে গুলি করে নিকেশ করতে গিয়ে তার ল্যাজের বেড়ের মধ্যে পড়তে পড়তে অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছে, এমন ঘটনাও আছে তার শিকারী জীবনে। কিন্তু পৃথিবীর সব থেকে ভয়ঙ্কর বিষধর সাপ, কিংবা কোবরার কবল থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসার মত ঘটনা তার কেন, আর কোন মানুষের জীবনেই বোধ হয় ঘটেনি এর আগে।

শশধরদের কয়েকশ' বিঘা আবাদি জমি ছিল কটক জেলার দক্ষিণে, সমুদ্রের প্রায় ধারে। বছর চল্লিশেক আগে সেদিকের গোটা অঞ্চলটায় ছিল সুন্দরবনের মত সুঁদরী, গামা, বানী, গর্জন, ক্যাওড়া, গরাণ, বখরা প্রভৃতি গাছ, আর নানা রকম কাঁটা গাছের ঝোপঝাড়ে ভর্তি। উত্তর দিকের জঙ্গলে দেখা যেত আম, জাম, কাঁঠাল, নারকেল, নিম প্রভৃতি কিছু মিঠে মাটির গাছ, আর কিছু ভাঙা দালান মন্দির। লোকে বলত এককালে বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল সেদিকে। পর্তুগীজ দস্যুদের অত্যাচারে লোকে ভিটে-মাটি ছেড়ে পালিয়ে যায় অন্য দিকে। কয়েকশ' বছরে সেদিকে গজিয়ে ওঠে দুর্গম জঙ্গল। হরিণ শুয়োর চিতা আর নানা জাতের সাপ-খোপের আড্ডাখানা হল সেই সব জঙ্গল। শশধরের দাদু যখন কলকাতার মহাজনদের কাছ থেকে এই জঙ্গল বন্দোবস্ত নেন, তখন তার বয়স দশ-বার বছর। ক্রমে মালিকরা সেই-সব জঙ্গল কেটে তৈরী করেছে আবাদী জমি। সেই জমির সূত্রেই শশধরের যাতায়াত ছিল গড়হরিশপুরে। তখনকার

দিনে সেদিকে যাতায়াত ছিল এক বিরাট ব্যাপার—কটক স্টেশনে নেমে পঞ্চাশ মাইল সেই আমলের বাসে, আর মাইল দশেক পা-গাড়ীতে পৌঁছোতে হত সেখানে।

গ্রামের পশ্চিমে সিকি মাইলের মধ্যে ছিল বরুণা নামের একটা চওড়া নদী। নদীর ওপার থেকে পুরী জেলার কোনারক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল একটা বিরাট বন। বনটার নামও ছিল বরুণা। শশধরের বয়স যখন আঠার উনিশ, তখনই সে বেশ বন্দুকবাজ হয়ে উঠেছে। গড়হরিশপুরে গেলেই সেখানকার ভাগবত আর বর্মানন্দকে নিয়ে শিকারে বেরোন ছিল তার প্রধান কাজ—কখনো ভোর ভোর চলে যেত হাঁস-শরাল মারতে সমুদ্রের ধারে, কখনো হরিণ মারতে রাত কাটাত বরুণা-জঙ্গলে। বরুণার কোন্ দিকে কি জন্তু পাওয়া যায়, কয়েক বছরের মধ্যে সে সম্বন্ধে তাদের ভাল ধারণা জন্মে গিয়েছিল। গড়হরিশপুর গ্রাম বরাবর নদীটা পেরিয়েই নীচের দিকে ছিল ছাড়া ছাড়া নোনা জঙ্গল। এই জঙ্গলটার পরেই ছিল পাঁচ সাত বিঘার মতো একটা ফাঁকা জায়গা। এই ফাঁকটার মধ্যে ছিল একটা বহু পুরান মিঠা জলের পুকুর। শিকারে বেরিয়ে শশধররা সময় সময় এই পুকুরের আশেপাশে কৃত্রিম ঝোপ তৈরী করে তার মধ্যে বসত হরিণ শিকার করতে। চাঁদের আলোয় সেই ঝুপড়িতে বসে তারা রাতের পর রাত দেখত চিতা, শুয়োর, হরিণ, এমন কি স্ট্রাইপারও সেই পুকুর থেকে জল খেয়ে যেত, যে-যার সময় মতো।

শশধর যখনই গড়হরিশপুরে যেত, গুরুজনরা তাকে সেদিকের আপদ বিপদ সম্পর্কে বিশেষভাবে সাবধান করে দিত—বাঘধরা সম্বন্ধে যত না বলত, বিষহরির চ্যালাদের সম্বন্ধে বলত তার থেকে অনেক বেশি।

"যাচ্ছ তো বাপু সেদিকে, কিন্তু খুব সাবধান! রাত্তিরে টর্চ ছাড়া এক পাও নড়বে না ; দিনের বেলাতেও চলাফেরা করবে খুব দেখে শুনে।"

সত্যি নানা রকম সাপ ছিল উড়িষ্যার বিভিন্ন জঙ্গলে। কোনটা লাল, কোনটা বাদামী, কোনটা হলুদ, কোনটা সবুজ, কোনটা বা ঝিম কালো। কোনটা থাকে গাছের কোটরে, কোনটা গাছের ডালে ডালে। এক-একটা সাপখেকো শঙ্খচূড় বা হ্যামাড্রায়াড পনর-কুড়ি ফুট লম্বা। কোনটার সবটাই কালো, কোনটার ফণা থেকে শরীরের অর্ধেকটাতে থাকে কালোর ওপর সাদা রিং, বাকিটা কালো। কোন শঙ্খচূড়ের রঙ হল শুধু সাদা বা লাল। বেকায়দা বুঝলেই সুপুরিগাছের খোলের মত একটা লম্বাটে ফণা বিস্তার করে মাটি থেকে সোজা ছ-সাত ফুট দাঁড়িয়ে উঠে ভীষণ জোরে সোঁ সোঁ শব্দ করতে থাকে। বিশ-ত্রিশ হাত দূর থেকেও শুনতে পাওয়া যায় সে শব্দ; একটা বয়সে নাকি শঙ্খর মত আওয়াজ বের হয় এদের মুখ থেকে। তার বিষ এমনই মারাত্মক যে, তার কামড়ে হাতির মত একটা বিশাল প্রাণীও মারা যায় তিন ঘণ্টার মধ্যে, আর মানুষ তো চোখ উল্টায় মাত্র দু'মিনিটে। এত বড় আর ভারী বিষধর সাপ পৃথিবীতে আর নেই। এই জন্যই বোধ হয় উড়িষ্যার লোকেরা একে বলে অহিরাজ। আবার, পঁচিশ-ত্রিশ-ফুটি এমন সব অজগর রাক্ষস ছিল সেদিকে, যারা দিনে দুপুরেও গিলত হরিণ শুয়োর।

একবার শীতের রাতে শশধর, ভাগু, আর বর্মানন্দ একটা ডিঙায় চেপে শিকারে বেরুল। বরুণা নদী পেরিয়ে নদীর ধারে-ধারে চলে গেল পাঁচ মাইলটাক উত্তর দিকের জঙ্গলে। হরিণ মারার জন্য তারা নদীর ধারের জঙ্গলেই ঘোরাঘুরি করত বেশি, বালিয়াড়ির জঙ্গলে বড় একটা যেত না। সে দিকটায় জন্তু-জানোয়ার সব রকম থাকলেও জঙ্গল এমনি ঘন যে, তার মধ্যে দিনের বেলাতেও ঢোকা কঠিন ছিল। তেমন জঙ্গলকে ওদিকের লোকেরা বলে 'কালা জঙ্গল'। বাইরের দিকের জঙ্গলেও ছিল হরিণের চরাবরার মত নানা রকম গাছগাছালি; তাই সেদিকেও ছিল হরিণদের আনাগোনা। সেদিন তাদের অদৃষ্ট ছিল নেহাতই মন্দ; সমস্তটা রাত ঘোরাঘুরি করেও কোন হরিণের

দেখা পেলে না তারা। ভোরের দিকে ডিঙা নিয়ে নিজেদের এলাকার কাছাকাছি পৌঁছে ওরা স্থির করল একবার বরুণা-জঙ্গলের কিছুটা ভেতরে গিয়ে দেখবে সেখানে কোন শিকার পাওয়া যায় কি-না। যে পুকুরটায় জন্তু-জানোয়ার জল খেত, তার প্রায় সিকি মাইল পশ্চিমে বালিয়াড়ির জঙ্গলের ভেতরে ছিল ঘাসে ভর্তি পাঁচ-সাত বিঘার একটা ফাঁকা জায়গা। এরকম ফাঁকা জায়গাকে ওড়িয়ারা বলে পদা। পদাটা বরুণা-জঙ্গলের ভেতরে ছিল বলে, সেটাকে লোকে বলত বরুণা-পদা। নিরিবিলি বলে ভোরের দিকে সেই পদায় হরিণ আর জংলী মুরগী আসত চরতে।

বরুণা-পদায় যাবার জন্য একটা সরু পায়ে চলা পথ ধরে ওপরের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল দলটা। লোড করা বন্দুক হাতে সব থেকে আগে শশধর, তার পেছনে ভাগু, আর সব থেকে পেছনে বর্মানন্দ। সেই পথে এগিয়ে যেতে যেতে তারা শুনতে পাচ্ছিল এদিকে-সেদিকে বন-মোরগের ডাকাডাকি—ঠিক যেন গেরস্ত বাড়ীর মোরগের কোঁক্কর-কোঁ রব। ওপারের জঙ্গলের ভেতরে প্রায় পঞ্চাশ গজ গিয়ে রাস্তার ঠিক ধারে জুন ঘাসের মধ্যে তারা দেখতে পেল তিন-চার ফুট গভীর, আর চার-পাঁচ হাত বেড়ের একটা জলের গর্ত ; তাতে তখন জল ছিল বড় জোর তিন কলসি। সেই গর্তের পরেই ছিল একটা বাঁক। এই বাঁক থেকে আরো দু'শ গজের মত এগিয়ে কতকগুলো নিম আর শেওড়া গাছের ভেতর দিয়ে দেখা গেল একটা ছোট চিতল, তার মাথাটা ডুবে আছে ঘাসের মধ্যে। হরিণটা মরতেই এসেছিল সেখানে। শশধরের এক অব্যর্থ আড়াই ইঞ্চি এল-জি গুলির ঘায়ে সেটা পড়ে গেল মাটিতে। ভাগু আর বর্মা গিয়ে সেটাকে তুলে নিয়ে এল জঙ্গলের ভেতর থেকে। দলটা আবার ফিরে চলল আগের পথে। বন্দুক হাতে আগে আগে শশধর ; ভাগু আর বর্মানন্দ হরিণটাকে বয়ে নিয়ে আসছিল তার পিছে পিছে। অল্পক্ষণের মধ্যে একটা বাঁক ঘুরে শশধর এসে পড়ল সেই জলের গর্তের

একেবারে ধারে। হরিণটা বয়ে আনতে হচ্ছিল বলে ভাগু আর বর্মা তখন গর্ত থেকে আট-দশ হাত পিছিয়ে পড়েছে। গর্তের দিকে নজর পড়তেই শশধর চমকে উঠে দেখতে পেল তার মধ্যে বিড়ে পাকিয়ে বসে মাথা নামিয়ে জল খাচ্ছে একটা বিরাট সাপ। সেটা কি সাপ সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে না পারলেও, ঠিক পরের মুহূর্তেই বুঝতে পারল সাক্ষাৎ যমের কবলে পড়েছে সে। গর্তের ধারে শশধরের সাড়া পেয়েই যমটা সাঁ করে তার আড়াই ফুটের মধ্যে লম্বা একটা ফণা মেলে সোজা দাঁড়িয়ে উঠল সাত-আট ফুট উঁচু হয়ে, আর সেইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ধীরে-ধীরে হিস্ হিস্ শব্দ করতে লাগল নাকে মুখে। তার ফণাটা তখন শশধরের মাথা থেকে অন্তত ছ-ইঞ্চি উঁচুতে। পেছন থেকে ওরা দু'জনও দেখতে পেল যমটাকে ঐভাবে দাঁড়িয়ে উঠতে। ভাগু পেছন থেকে চিৎকার করে বলে উঠল, "একদম কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে যাও।" ভাগু আর বর্মা জঙ্গলের অনেক খবর জানে। শশধরের হাতে গুলিভরা ডবল-ব্যারেল বন্দুক ; শুধু বাঁ দিকে ঘুরতে গেলেও বন্দুকের বত্রিশ ইঞ্চি নলের ডগাটা লেগে যায় সাপের গায়ে। তবু তার করার ছিল না কিছুই। নিতান্ত অসহায়-ভাবে কাঠের মত দাঁড়িয়ে পড়ল শশধর। সেইভাবে দাঁড়িয়ে থেকেই সে আবছা-আবছা দেখতে পাচ্ছিল অহিরাজ তার ছড়ান ফণাটা একবার একটু বাঁদিকে বেঁকিয়ে তাকে দেখছে, আবার একটু ডানদিকে ঘুরিয়ে ভাগুদের দেখছে। প্রতি মুহূর্তেই শশধর ভাবছিল এই বুঝি শঙ্খচূড়ের কোপ পড়ে মাথায়। তার তখন মনে হচ্ছিল সে বুঝি দাঁড়িয়ে আছে এক জল্লাদের উঁচানো খাঁড়ার নীচে। আর কেউ এই অবস্থায় পড়লে, হয়ত সাপটাকে দাঁড়িয়ে উঠতে দেখেই জ্ঞান হারাত, কিন্তু বনে জঙ্গলে নানা অবস্থার মধ্যে জন্তু-জানোয়ার শিকার করতে করতে সে-ও হয়ে পড়েছিল এক জল্লাদ বিশেষ। তবু মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শশধরের প্রাণও বাঁচার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। খুব বেশি হলে শশধর এক মিনিট দাঁড়িয়েছিল সেইভাবে। গর্তটার

ওপারে, রাস্তার বাঁ-দিকে, শশধর যেখানে দাঁড়িয়েছিল, তার তিন-চার হাতের মধ্যে ছিল একটা মোটা আমগাছ। মরিয়া হয়ে শশধর এক লাফে সরে গেল সেই আমগাছের ধারে। সর্পরাজ তখনো পারত শশধরের গায়ে পায়ে কোপ ঝাড়তে; কিন্তু সে তা না করে, শশধর আম গাছের ধারে লাফিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেও একটা প্রকাণ্ড লাফ মেরে, তাদের বাঁ-দিকের কোণাকোণি জঙ্গলের ওপর দিয়ে ডাল-পালা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে অদৃশ্য হল কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে। অহিরাজ পালিয়ে যাবার সময়েই শশধর ভাল করে দেখতে পেল তার সম্পূর্ণ চেহারাটা। ফাঁড়া কেটে গেলেও কিন্তু শশধরের সমস্ত শরীর মনে হচ্ছিল অবশ; জামা-প্যাণ্ট ভিজে সপ-সপ করছে ঘামে। ভীষণ অবসাদে বন্দুকটা লাঠির মত ধরে আমগাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল সে। ভাণ্ড আর বর্মানন্দ শশধরের কাছে এসে দাঁড়াল। ভাণ্ড এগিয়ে গিয়ে শশধরের বন্দুকটা নিজের হাতে নিয়ে তাকে টেনে নিয়ে এল রাস্তার ওপরে। এতদিন শঙ্খচূড়ের কেবল গল্পই শুনে এসেছে শশধর, নিজের চোখে তাকে দেখেনি কখনো। সেদিন তাকে ভাল করেই দেখা দিয়ে গেল বরুণার এক বহু পুরানো অহিরাজ। সেটা লম্বায় ছিল পনর-কুড়ি ফুট, বেড় হবে দশ-বার ইঞ্চি; ফণার দিক থেকে শরীরের অর্ধেকটা ছিল কালোর ওপরে সাদা রিং-রিং দাগ, বাকিটা শুধু কালো।

কোনরকমে শরীরটা বাড়ীতে টেনে নিয়ে গেল শশধর। ঘটনাটা তাকে পেয়ে বসল ভূতের মত। দিনে রাতে একটুও শান্তি পেত না মনে। দিনের বেলাতেও তার চোখে ভাসত মাথার ওপরে যমটার সেই উঁচানো ফণাটার দৃশ্য। রাতে একটু ঘুমিয়ে পড়লেই শশধর স্বপ্ন দেখত নানারকম সাপের। কাপড়ের পাড়, দড়ি, একটা গাছের শুকনো ডাল, বটের ঝুরি, এমন কি চক্‌চকে লম্বা কিছু দেখলেও সে চমকে চেঁচিয়ে উঠত সাপ সাপ বলে। ভুলেও সে জঙ্গলের দিকে পা বাড়াত না আর। বন্ধ হল তার সখের শিকার। ভাণ্ড, বর্মানন্দ

আসত বলতে, কিন্তু তাদের ফিরিয়ে দিত শশধর। শশধরের মা-ও তখন গড়হরিশপুরেই। রাত্রিতে ঘুমের ঘোরে শশধরের চিৎকারে তারও ঘুমের ব্যাঘাত হতে লাগল। মাসখানেক এইভাবে কাটার পর শশধরের মামা সুবিমল দেখল ব্যাপার বড় গুরুতর—শশধরের মাথা বুঝি খারাপ হয়ে যায় এবার। সুবিমল ভাবছিল শশধরকে তার দেশের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলে হয়ত তার এই উৎকট রোগটা সেরে যেতে পারে। ওদিকে ভাগবত আর বর্মানন্দও যুক্তি পরামর্শ করছিল কি করা যায় তাকে নিয়ে। একদিন ওরা ছ'জনেই চলে গেল মহকুমা শহর জগৎসিংপুরে। কয়েক জায়গায় ঘোরাঘুরি করে শশধরের চিকিৎসার একটা ব্যবস্থা করে ফেলল তারা ; কিন্তু ব্যাপারটা রাখল সম্পূর্ণ গোপন—সুবিমলকে পর্যন্ত জানতে দিল না কিছুই।

ভাগু-রা শহরে যাবার ছ'দিন বাদে লম্বা চুলদাড়িঅলা গেরুয়া-বসনধারী, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা কাটা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা পরা এক মধ্যবয়সী মোটাসোটা সাধু বাবাজী হঠাৎ ভোর ভোর এসে হাজির হল শশধরদের বাড়ীতে। তার কাঁধে ছিল একটা কাঁথার তৈরী ঝুলি। সুবিমলই প্রথমে বাড়ীর বাইরে এসে কথা বলল সাধুর সঙ্গে। শশধর তখন গায়ে কম্বল জড়িয়ে বিছানায় বসে আছে। সাধু নিজের কোন পরিচয় না দিয়ে সোজা গম্ভীর গলায় বলল, "দেবী বিষহরির আদেশ পেয়ে তোমাদের রোগী দেখতে এসেছি —সে কোথায় ?" শশধরকে সাধুর সামনে এনে তাকে দক্ষিণমুখী করে বসান হল একটা কুশাসনে। সাধু উত্তরমুখী হয়ে তার সামনে বসে জলভর্তি একটা ঘটে ডান হাত ঠেকিয়ে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ল কিছুক্ষণ ; তারপর ডান হাতে শশধরের মাথা ছুঁয়ে আবার অস্পষ্ট-ভাবে মন্ত্র পড়ল মিনিট পাঁচেক, আর সেই সময়ের মধ্যে ঘট থেকে এক আজলা করে মন্ত্র পড়া জল তিনবার ছিটিয়ে দিল শশধরের গায়ে মাথায়। এই সব প্রক্রিয়ার পর বাবাজী বলল, "একটা মন্ত্র দিয়ে যাচ্ছি ; সেটা এঁটে দিতে হবে শোবার ঘরের দেওয়ালে, আর ওকে

রোজ শোবার সময় মন্ত্রটা ভক্তিভরে তিনবার পাঠ করে প্রণাম জানাতে হবে দেবী বিষহরির উদ্দেশ্যে।" এই পর্যন্ত বলে ঝোলার ভেতর থেকে এক টুকরো বালি কাগজ বের করে সুবিমলের হাতে দিল, আর বলল, "ভয় নেই, মা বিষহরির কৃপায় শীগ্‌গিরই কেটে যাবে গ্রহের দৃষ্টি।"

সুবিমল কাগজটা মেলে দেখে তাতে চালপোড়া কালিতে লেখা আছে—

আস্তিকস্য মুনের্মাতা ভগিনী বাসুকেস্তথা
জরৎকারুমুনেঃ পত্নী মনসাদেবী নমোঽস্তুতে।

কাজ শেষ করে বাবাজী কয়েক মিনিটের মধ্যে হাওয়া। টাকা-পয়সা নিলনা কিছুই। বলে গেল গুরুর নিষেধ আছে। পয়সা নিলে মন্ত্রের ফল হবে না। তবে রোগ সেরে গেলে বৈতরণী-নদীর তীরে বাবা আখণ্ডলমণির যে মন্দির আছে, সেখানে যেন একটা পূজা দেয় শশধরের নামে।

আসলে বাবাজীর পোশাক, মন্ত্রতন্ত্র সব কিছুই সাজান। বাবাজী এক যাত্রাদলের লোক। তাদের মনসা-মঙ্গল পালা থেকে মন্ত্রটা লিখে এনে গড়হরিশপুরে অভিনয় দেখিয়ে গেল এক-হাত। এই ব্যবস্থা করতেই সেদিন ভাণ্ড-রা গিয়েছিল মহকুমা শহরে। এখন, বাবাজীর চমকদার ক্রিয়া-কলাপের ফলেই হোক, আর মন্ত্রের শক্তির জন্যই হোক, সকলে অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করল, এই মন্ত্র জপা শুরু করার পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে শশধরের সেই উৎকট সাপের ভয় কেটে গেল, আবার আগের মত স্বাভাবিক হল সে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা তার জানা হয়নি আজও।

হ্যালিডে দ্বীপের রাজা বাঘ



সুন্দরবনের মাতলা নদীর মাঝখান দিয়ে যে উত্তর-দক্ষিণে কুড়ি মাইল লম্বা একটা চোরা দ্বীপ আছে, একথা অনেকেরই জানা নেই। ভাটার

সময় সেটা মাথা উঁচু করে কিছুটা দাঁড়িয়ে ওঠে চীনের চওড়া প্রাচীরের মতো, আবার জোয়ারের সময় মাথা নামিয়ে তলিয়ে যায় জলের গভীরে। এই চোরা দ্বীপটার কিছু দক্ষিণ-পশ্চিমে মাতলার মোহনার দিকে রয়েছে একটা ছোট্ট দ্বীপ। সাহেবরা এই দ্বীপের নাম দিয়েছিল হ্যালিডে আইল্যাণ্ড ; লাটের লোকেরা তাকে বলে বাহার জিঞ্জরা। দ্বীপটায় কোন লোক বাস করে না, আবাদও নেই সেখানে। পুব থেকে পশ্চিম দিকে ক্রমশ ঢালু হয়ে গিয়েছে দ্বীপটা। গোটা দ্বীপটাই জঙ্গলে ভর্তি। পুবের বালিয়াড়িতে দেখা যায় বানী, গরাণ, টক-ক্যাওড়া, চাক-ক্যাওড়া, তরাঝোপ ; মাঝে-মাঝে দু-চারটা লম্বা লম্বা করঞ্জগাছ দাঁড়িয়ে আছে জঙ্গলের সেপাইয়ের মত। পশ্চিমের যে অঞ্চলটা জোয়ারের জলে ডুবে যায়, তাতে ছিল গামা, কালিআইল, হেঁতাল এবং কিছু নোনা ঝোপঝাড়। দ্বীপের নীচু জঙ্গলে জোয়ারের জল ঢুকে পড়লে, সেদিকের হরিণ, বরা, বাঘ পালিয়ে আসত বালিয়াড়ির উঁচুর দিকের জঙ্গলে। শোনা যায় গত মহাযুদ্ধের সময় ইংরেজ সৈন্যদের একটা শক্ত ঘাঁটি ছিল এই দ্বীপে, কিন্তু জাপানী বিমান টন টন বোমা ফেলে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়। বোমার ঘায়ে যেসব খাদ সৃষ্টি হয়, তাতে বৃষ্টির জল জমে থাকত বলে পরের দিকে তা থেকে প্রায় বারোমাসই পাওয়া যেত প্রচুর মিঠে জল। বনের বাঘ, হরিণ, শুয়োর, যে যার সুবিধে মতো জল খেত সেই সব জলা থেকে।

দ্বীপটা ছিল চিতল হরিণের জন্য বিখ্যাত—আর যেখানে হরিণ সেখানেই বাঘ, ঠিক সমুদ্রে ইলিশের ঝাঁকের আশপাশের হাঙর-রাক্ষসদের মতো। বছর পনর আগে যখন দেশে শিকার পুরোপুরি নিষিদ্ধ হয়নি, চারজন সৌখিন শিকারীর একটা দল রসুলপুর ঘাট থেকে নৌকো নিয়ে বেরিয়েছিল বাহার-জিঞ্জরা দ্বীপে বাঘ শিকারে যাবে বলে। সময়টা ছিল শীতকালের শুক্লপক্ষ। নামখানা রেঞ্জ আপিসে শিকারের পাশ দেখিয়ে, ধঞ্চি রিজার্ভ ফরেস্টের গা দিয়ে

মাতলার অর্ধেকটা পেরিয়ে তিন দিনের দিন সকালের দিকে শিকারীরা পৌঁছে গেল দ্বীপটার পশ্চিম কূলে। বাতাস আর ঢেউয়ের জন্য মাতলার এক ধারে নৌকো বাঁধা সম্ভব নয় বলে, নৌকোটা দ্বীপের এক ধারের একটা খাড়ির মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল পূবদিকে। খাড়িতে তখন ভাটা চলছিল। দু'জন মাঝি নীচে নেমে জলের ধারে ধারে গুণ টেনে নিয়ে যাচ্ছিল্ নৌকোটা ; একজন মাঝি ছিল দাঁড়ে বসে, আর একজন লগি নিয়ে। শিকারীরা ছইয়ের মধ্যে বসে তাস খেলছিল। শিকারপার্টির পাচক, ভোগী, আগে কখনো সুন্দরবনে আসেনি ; ছেলেটা নৌকোর পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছিল দ্বীপের জঙ্গলের ফাঁকে কোথাও কোন জানোয়ার দেখা যায় কি না। নৌকো যত উজানে এগোচ্ছিল, পাড়ের খাড়াইও তত কম ছিল। হঠাৎ এক সময় ভোগী 'বাঘ-বাঘ' বলে চেঁচিয়ে উঠল। ভোগীর চিৎকার শুনে নীচের মাঝিরা গুণের দড়ি-দড়া ফেলে দিয়ে ছুটে পালিয়ে এল নৌকোয়। তাদের চিৎকার চেঁচামেচি শুনে দলের নেতা, অজিত, ছইয়ের বাইরে বেরিয়ে এসে, দ্বীপের ওপরে যেদিকে যতটা নজর চলে তাকিয়ে দেখে কোথাও কিছু নেই। সকলের মনেই ভয় থেকে যায় দেখে, অজিত তার বন্দুকে গুলি ভরে নিয়ে নৌকো থেকে নেমে পড়ে। দ্বীপের ওপরে উঠে একটু এদিকে ওদিকে তাকাতেই কতকগুলো বানী গাছের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেল একটা হরিণের পাল সরে যাচ্ছে বনের ভিতরের দিকে। অজিত বুঝতে পারে ভোগী সেই পালেরই কোন হরিণের পেছনের লালচে-বাদামী রঙ দেখেই চেঁচিয়ে উঠেছিল বাঘ ভেবে। অজিত নৌকোয় ফিরে এসে ভরসা দিতে মাঝিরা আবার নীচে নেমে নৌকো টানতে লাগল। বন্দুক হাতে জলকাদার মধ্য দিয়ে অজিতও চলল তাদের সাথে সাথে। সুন্দরবনের শিকারের অসুবিধাই এই, যেখানেই যাবে গায়ে-পায়ে জলকাদা না লাগিয়ে এগোবার উপায় নেই।

খাড়িটা ক্রমশ সরু হতে হতে শেষ হয়েছে বালিয়াড়ির পুবদিকের

এক জায়গায়। খাড়ির মাথার ত্রিশ-চল্লিশ হাত আগেই নৌকো নোঙর করা হল দক্ষিণ কিনারে। নৌকো থামতেই মণি আর অজিত তাদের রাইফেল বন্দুক নিয়ে উঠে গেল ওপরে। জঙ্গলটা সেখানে দুটো ভাগ হয়ে রয়েছে--পুব দিকে কম, পশ্চিম দিকটাতেই বেশী ; মাঝের খানিকটা ফাঁকা জায়গায় ছিল বালি আর ছাড়া-ছাড়া দু'চারটে ছোট আগাছা। বালির জায়গাটার ওপর দিয়ে দু'দিকের জঙ্গল দেখতে দেখতে হাত পঞ্চাশেক গিয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গেল তারা। সেখানে পড়ে ছিল কয়েক টুকরো নাড়িভুঁড়ি, আর একটা বাঘের পায়ের ছাপ। এতবড় বাঘের পায়ের দাগ অজিতের মত দুঁদে শিকারীও দেখেনি এর আগে—মাঝারি সাইজের থালার মত এক-একটা ছাপ। নাড়িভুঁড়ির ধারে ধারে বালির মধ্যে যেভাবে দাগগুলো বসে গিয়েছিল, তা থেকে বোঝা যাচ্ছিল, বাঘটা যেমনি চেহারায় বিশাল, তেমনি ওজনে ভারী—এত বিরাট যে তেমন বাঘ সমস্ত সুন্দর-বনের মধ্যেও আর ছিল কি না সন্দেহ। বালির ওপর দিয়ে তার চলে যাবার থাবার দাগ লক্ষ্য করে অজিত মাথায় হাত দিল ; ফিসফিসিয়ে বলল, "এগার-বার ফুটের কম নয়—মাথা নিয়ে শরীরটা অন্তত সাত ফুট, আর ল্যাজটা কম করেও চার ফুট ; ওজন সাত আট মন হওয়া আশ্চর্যের নয়। এর গলা থেকে নিশ্চয়ই নেমেছে ষাঁড়ের মত গলকম্বল, আর পেটটাও নিশ্চয়ই থলথল করছে চর্বিতে।"

মণি বাঘটার চেহারার আঁচ করে অজিতের কানে কানে বলল, "বাঘের দেবতা দক্ষিণরায় স্বয়ং বুঝি বাঘের আকার নিয়ে হাজির হয়েছেন এই দ্বীপে।"

বোঝা গেল বাঘটা ফাঁকায় জন্তুটা মেরে ছেঁড়াছিড়ি করে কিছুটা খেয়েছে, বাকিটা টেনে নিয়ে গিয়েছে ছোট বনটার ভেতরে—বালির ওপর একটা ঘষড়ান দাগও দেখা গেল ; দাগটা চলে গিয়েছে ছোট বনটার দিকেই। হয়ত কাছেই কোথাও লুকিয়ে রেখে সরে গিয়েছে, আবার সময় মত এসে তার শিকারের ওপর বসবে। একটা হেজে

যাওয়া মাংসের গন্ধও যেন আসছিল ছোট বনের দিক থেকে। অজিত খোলাখুলি বলেই ফেলল, "মাটিতে চাপাটোপে বসে এর মোকাবিলা করার মত সাহস বা ক্ষমতা আমার নেই।" চাপা-টোপ হল বার চোদ্দ হাত ঘেরের বুক সমান একটা গর্ত ; তার ওপরটা থাকে ডালপালা দিয়ে ঢাকা, যাতে তাকে দূর থেকে ঝোপঝাড়ের মত দেখায়।—সেখানে আর ঘোরাফেরা করা নিরাপদ নয় ভেবে তারা ফিরে গেল নৌকোয়।

সেদিন আর কেউ দ্বীপের ওপরে উঠল না। দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে নৌকোটা খাড়ির মধ্যজলে নিয়ে গিয়ে একচোট ঘুমিয়ে নিল সকলে। বিকেলের দিকে যখন ভরা জোয়ার, অজিত মাঝিদের নিয়ে খাড়ির মাথার দিকে হাত-ত্রিশেক লম্বা একটা জাল পেতে রাখল খাড়ির চওড়া বরাবর, যাতে ভাটার সময় জল নেমে গেলে জলের সঙ্গে মাছও চলে যেতে না পারে। ঘন্টাখানেক বাদে সেখানকার সব জল বেরিয়ে যেতে দেখা গেল কাদার মধ্যে কিলবিল করছে নানা আকারের কাঁকড়া আর পার্শে, গুরজালি, খয়রা, পায়রা-চাঁদা, রিংচিং প্রভৃতি মাছ। চিমটে দিয়ে কাঁকড়াগুলো ঝুড়িতে তুলে মোটা দড়ির জাল দিয়ে ঢাকা দিল ঝুড়ির মুখ। মাছগুলো তুলে নিল আর একটা ঝুড়িতে। যাদের জলকাদায় নেমে মাছ ধরার অভ্যাস আছে, সুন্দর-বনের খালে-খাড়িতে নৌকো ভ্রমণে তাদের মাছ কিনতে হয় না। নানা ধরনের টিল, জংলী মুরগি, কাস্তেচরা, শরাল প্রভৃতি পাখি, আর হরিণের মাংসের দিক থেকেও তাদের রয়েছে প্রচুর সুযোগ।

রাত্রিটা বন্দুক রাইফেল হাতে নিয়ে পালা করে পাহারা দিল অনিল, অজিত, মণি আর মনো। অনিল আর মনো ছিল এদের মধ্যে কাঁচা শিকারী। মনোর পাহারা দেবার পালা ছিল একেবারে শেষ রাত্রির দিকে। সে যখন পাহারায় বসল, দ্বাদশীর চাঁদ তখন ডুবে গেছে, চারদিক জমাট অন্ধকারে ভরা। জোয়ারের জলে নৌকোটা

যেভাবে ভেসে উঠেছিল, তাতে নৌকোর পাটাতনে বসেও দ্বীপের ওপরের দিকে নজর দিতে পারা যাচ্ছিল ভালোভাবে। নৌকো থেকে অন্ধকারের ভেতর দিয়ে বনের আবছা-আবছা গাছগুলোকে মনে হচ্ছিল যেন এক-একটা ভূত-প্রেত বিশেষ। মনোর নিজের কোন রাইফেল ছিল না। মণির ছিল দুটো রাইফেল—একটা ·৪০৫ উইনচেষ্টার, আর একটা হেভিবোর ·৪৫০।৪০০, যা দিয়ে বাঘ কেন, জায়গা মতো ঘা দিতে পারলে হাতি গণ্ডারও খতম করা যায়। মণির ·৪০৫ রাইফেলটি হাতে নিয়ে পাহারা দিচ্ছিল মনো। প্রচণ্ড শীত। কম্বলে তার সমস্ত শরীর ঢাকা, আর মাথায় একটা মাফলার জড়ান। ছইয়ের একটু বাইরে পাটাতনের ওপর জোড়াসন হয়ে বসেছিল মনো, তার ডান হাতের আঙুল রাইফেলের ট্রিগারে। তার চোখ দুটো ঘুরে বেড়াচ্ছিল অন্ধকার দ্বীপের এদিকে সেদিকে। বনের ভেতরের দিক থেকে জোরে জোরে হাতুড়ি ঠোকার মতো একটা ঠক্-ঠক্ শব্দ ভেসে আসছিল মাঝে মাঝে। সুন্দরবনের কোন কোন জঙ্গলে শুনতে পাওয়া যায় ওরকম শব্দ, যেন কত কাঠমিস্ত্রি কাজ করছে বনে-বনান্তরে। শব্দটা নাকি একরকম পাখির। লাটের লোকেরা তাকে হাতুড়ি ঠোকা পাখি বলে। দ্বীপের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় ঘুমে, কয়েক সেকেণ্ড বা কয়েক মিনিটের জন্য চোখ দুটো বুঝি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল মনোর; কখন যেন আবার আপনাথেকেই চোখ খুলে যায় তার। চোখ খুলে যেতে প্রথমেই তার নজরে পড়ল দ্বীপের ওপরের দিকে কুড়ি পঁচিশ গজ দূরে দুটো বড় বড় জ্বল-জ্বলে চোখের মত কি যেন স্থির হয়ে রয়েছে। মনোর মনে হল সে বুঝি স্বপ্ন দেখছে। একবার সে অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে আবার তাকাল সোজাসুজি সামনের দিকে—না, জ্বল-জ্বলে জিনিস দুটো একটুও নড়েনি তো! ঠিক আগের মতোই যেন তাকিয়ে আছে তার দিকে। কম্বলের ভেতর থেকে বাঁ হাতটা বের করে চোখ দুটো একবার রগড়ে নিল সে—না, স্বপ্ন দেখছে না সে নিশ্চয়ই।

মনোর মনে প্রশ্ন তোলপাড় করছে। কী আছে ওখানে? দিনের বেলার না-দেখা সেই দানবটা, না তার কোন দোসর, না আর কিছু! একবার জিনিস দুটো লক্ষ্য করে রাইফেল চালাবার কথা ভাবল, কিন্তু যদি হিতে বিপরীত হয় ভেবে গুলি চালাতেও সাহস করল না সে। শীতে না ভয়ে মনো তখন কাঁপছে। দাঁতে দাঁত লেগে যাবার দশা। অজিত আর মনোর বাঁ-হাতের মধ্যে বাঁধা ছিল একটা দড়ি। অজিত বলে দিয়েছিল দরকার হলে দড়িতে টান দিয়ে তাকে যেন ডেকে তোলে মনো। সেই জ্বল-জ্বলে জিনিস দুটোর দিকে চোখ রেখেই দড়িতে দু'বার টান দিল মনো। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করল সে, জিনিস দুটো যেন আরো কিছুটা এগিয়ে এল নৌকোর দিকে। অজিতের ঘুম খুব পাতলা। দড়ির টানে ঘুম ভেঙে যেতেই অজিত মাথা থেকে কম্বল ফেলে দিয়ে চট করে মনোর পাশে এসে বুঝতে চেষ্টা করল ব্যাপারটা কি। মনোর দৃষ্টি অনুসরণ করে সেও দেখতে পেল জ্বল-জ্বলে জিনিস দুটো। সে দুটো স্বপ্ন বা কল্পনা নয়। অজিতের বুঝতে বাকি থাকে না সে দুটো কি—কেবল বাঘ-সিংহের চোখ ছাড়া অন্ধকারে, শুধু তারার আলোয় আর কোন জন্তুর চোখ সেভাবে জ্বলে না। মনোর পাশে আর একজন লোককে দেখতে পেয়েই বোধ হয় এবার চোখ দুটো পিছু হটতে লাগল ধীরে ধীরে। দানবটা বোধ হয় দু'জন লোক একসঙ্গে দেখে একটু ভয় পেল। নৌকোর ভেতরে জোরাল টর্চ ছিল, কিন্তু সেটা আনতে গেলে কিছুটা সময় নষ্ট হবে ভেবে মনোর হাত থেকে তাড়াতাড়ি রাইফেলটা তুলে নিল অজিত ; পরের মুহূর্তেই ট্রিগারের লক আলগা করে সেই জ্বল-জ্বলে জিনিস দুটোর উদ্দেশ্যে চালিয়ে দিল একটা বুলেট। কিন্তু লক আলগা করার মুহূর্তে খুট করে যে শব্দটুকু হল, নিস্তব্ধ রাতে সেইটা পিশাচটার কানে গিয়ে ঠেকল জোরে, আর অমনি নিমেষের মধ্যে উধাও হল সেই দানব না পিশাচটা। গুলি পিশাচটার গায়ে লাগল না বোধ হয়, কিন্তু সেটা আর কাছে ভিড়বে না, যদি বনের কোন

প্রাণী হয়ে থাকে। গুলির শব্দে ভয় পেয়ে বনের হরিণ আর পাখি এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল তারস্বরে।

দেখতে দেখতে কুয়াশা ভেদ করে এক সময় আলো ফুটে উঠল প্রকৃতির পটে। বেলা আর একটু বাড়তে অজিতরা চারজনেই চড়ার ওপরে উঠে গিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজি করল, কিন্তু কোথাও রক্তের দাগ দেখতে না পেয়ে বুঝতে পারল আগের রাতের গুলিটা দানবটাকে ঘায়েল করতে পারে নি। নৌকোয় ফিরে এসে প্রাতরাশ সেরে শিকারী আর মাঝিরা আবার দ্বীপের উপর উঠে গেল দা কুড়ুল দড়ি আর গুলিভরা বন্দুক রাইফেল হাতে নিয়ে। বেলা বারোটার মধ্যে দ্বীপের ফাঁকা জায়গার পশ্চিম দিকে, বনের গায়ে গায়ে তিনটি মাচান তৈরী করা হল তিন-চার'শ গজ দূরে-দূরে। আর একটা মাচান তৈরী করা হল পুব দিকের ছোট বনটার ধারে একটা করঞ্জ-গাছের ওপরে, যে-দিকটায় আধ-খাওয়া মড়িটা ছিল, তার কাছাকাছি। সবগুলো মাচানই ছিল ডালপালা দিয়ে ঘেরা, যাতে জন্তু-জানোয়ার মোটেও না সন্দেহ করে যে সেখানে মানুষ আছে। সুন্দরবনের বাঘ গাছে উঠতে পারে না বলে, কোন মাচানই পনের-কুড়ি ফুটের বেশি উঁচু করা হল না। অবশ্য শিকারীদের একটা সাধারণ নিয়ম এই যে, এক মাত্র হাতি শিকারের মাচান ছাড়া অন্য মাচান বেশি উঁচু করার দরকার হয় না। মাচান একটু নীচু হলেই শিকারীদের পক্ষে জন্তু-জানোয়ার ঘায়েল করা সহজ হয়।

বিকেলের দিকে যখন সকলে বন্দুক-রাইফেল আর গুলির বাক্স নিয়ে যার-যার মাচানে উঠবে, ঠিক তখনই মনো অর্থাৎ মনোরঞ্জন বাধাল এক গোল। সে হঠাৎ বলে বসল, "আমি মাচানে বসব না।"

মনোর কথা শুনে অজিত তো একেবারে আকাশ থেকে পড়ল! জিজ্ঞেস করল, "কেন বসবে না, ব্যাপার কি?"—মনো বিশেষ কিছু ভাঙে না। মাঝে-মাঝে শুধু বলে, "না, বসব না"।

অজিত বোঝাতে চেষ্টা করে, "এত দূরে এলে রাইফেল বন্দুক

নিয়ে, বাঘ মারার পারমিট করা হল, আর এখন বলছ মাচানে বসবে না—তুমি ভয় পেয়েছ নিশ্চয়"।

সে-ও পাল্টা দু-কথা শুনিয়ে দিল অজিতকে—"আমাকে আর বাঘের ভয় দেখাতে হবে না। অনেক বাঘ দেখেছি, অনেক শিকার করেছি। আমি যদি মাচানে উঠি, তবে তুমি যেটা নিজের জন্য করেছ, সেইটাতে উঠব।"

অজিত ঠিক করেছিল সে উঠবে করঞ্জগাছের মাচানে। বোঝা গেল মনোর মনে সন্দেহ হয়েছে, অজিতের জন্য তৈরী মাচানটা বুঝি সব থেকে ভাল। অজিত তবু তাকে বোঝাতে চেষ্টা করে, "বাঘটা আমার ধারে কাছে আসবে মনে করছি—কেননা আধ-খাওয়া মড়িটা হয়ত আমার মাচানের কাছেই রয়েছে। ঐ বাঘকে সহজে ঘায়েল করা যাবে না। খুব জোরাল স্নায়ু আর ভাল হাতের টিপ না থাকলে, দু-চার গুলিতে ওর কিছু্ছু হবে না মনে হয়"।

কিন্তু মনোর ঐ এক কথা, করঞ্জগাছের মাচানেই সে উঠবে। অবশেষে সেই মাচানটাই তাকে ছেড়ে দেওয়া হল। অজিত কিন্তু মনোর জন্য তৈরী মাচানে উঠল না, করঞ্জগাছের তৈরী মাচান থেকে প্রায় দেড়'শ গজ দূরে আর একটা করঞ্জগাছের ডালে বিনা মাচানেই বসা ঠিক করল। অজিত রাখল তার নিজের বার-বোরের দোনলা সট-গান ; মনো নিল মণির আনা দুটো রাইফেলের ·৪০৫ রাইফেলটা ; অনিল রাখল তার নিজস্ব ·৩৭৫ ম্যানলিবার, আর মণির নিজের থাকল তার ·৪৫০ রাইফেল। আয়োজনের ত্রুটি থাকল না কারো। বিকেল চারটের দিকে মণি-মনো-অনিল যে যার রাইফেল আর বুলেটের বাক্স নিয়ে উঠে পড়ল মাচানে ; একটা মাচান পড়ে থাকল খালি। প্রত্যেক মাচানে পাশ-শিকারী হিসাবে থাকল একজন করে মাঝি। প্রায় সব রকম শিকারেই পাশ-শিকারীর দরকার হয়। শুধু ভোগী একলা লুকিয়ে থাকল নৌকোর খোলের মধ্যে।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, শুরু হল নিশাচর পাখি আর জন্তু-

জানোয়ারের ডাকাডাকি। পুবের জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে মাথা উঁচু করল ত্রয়োদশীর চাঁদ। শীতের জ্যোৎস্না দিনের মত ফুট-ফুট করে। চাঁদের আলোয় গাছের ফাঁকে চিকচিক করছিল মাতলার ছোট-বড় ঢেউগুলো। বালিয়াড়ির এক-একটা খালি জায়গাকে মনে হচ্ছিল যেন সাদা ফরাসের চাদর—কারা যেন যত্ন করে পেতে রেখেছে বনের প্রাণীদের সভা বসবে বলে। রাত একটু বাড়তে বনের মধ্যে আবার শুরু হল হাতুড়ি-ঠোকা পাখির এক-ঘেয়ে ঠক-ঠক শব্দ—বনের এই কাঠ মিস্ত্রিগুলোর দস্তুরই বুঝি এমনি, দিনমানে ঘুমোয়, আর রাতে খাটে। রাত দশটার পর পশ্চিম দিক থেকে জোয়ারের জল উঠে এসে দ্বীপের নীচু জায়গাগুলো সব ভাসিয়ে দিল। শুয়োরের ঘোঁত ঘোঁতানি আর হরিণের ডাক থেকে বোঝা গেল পশ্চিমের জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ারগুলো সরে এল উঁচুর দিকে। সকলেই সজাগ হয়ে বসে চারদিক লক্ষ্য করতে লাগল। রাত এগারটার দিকে মনোর মনে হল তার মাচান থেকে দশ-পনর গজ দক্ষিণের কিছু ঝোপঝাড় যেন জোরে-জোরে নড়ে উঠল। তার একটু পরেই জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল বড় হাঁড়ির মত একটা মাথা; শুধু মাথা নয়, গোটা শরীর নিয়ে ফাঁকা বালির ওপরে এসে হাজির হল একটা বিশাল আকৃতির বাঘ বা ব্যাঘ্র সম্রাট। মনো এবার বুঝতে পারে এই মহারাজেরই পায়ের দাগ দেখেছে তারা, আর আগের রাতে সে আর অজিত যে জ্বলজ্বলে জিনিস দুটো দেখতে পায়, সম্ভবত তাও ছিল এই দানবটারই দুটো অস্বাভাবিক চোখ। সত্যি বাঘটার গলা আর পেট থলথল করছিল চর্বিতে। দানবটা বন থেকে বেরিয়ে আপন মনেই ধীরে ধীরে উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল; বোধ হয় জোয়ারের সুযোগে বড় জঙ্গলে গিয়ে নতুন শিকার ধরাই ছিল তার উদ্দেশ্য। আগের মড়িটা হয়ত এরই মধ্যে সাবাড় করেছে রাক্ষসটা। সেইভাবে যেতে যেতে দানবটা এসে পড়ল মনোর মাচান থেকে দশ গজের মতো খাড়া পশ্চিমে। জঙ্গলের মধ্যে মনো এত কাছে

কখনো বাঘ দেখেনি, আর এমন একটা বাঘ দেখার কথা তো তার কল্পনাতেও আসেনি কোন দিন। বাঘটাকে মাচানের কাছাকাছি দেখতে পেয়েই মনো হাতের রাইফেলটা এক কোণে ঠেসান দিয়ে রেখে, একেবারে গুটিসুটি মেরে বসে পড়ল মাচানের মেঝেতে, যাতে সে কোনক্রমেই যমটার নজরে না পড়ে। মনো বুঝে নিয়েছিল, সে বাঘকে গুলি করা তার কম্ম নয়। এখন সকাল পর্যন্ত পৈতৃক প্রাণটা বজায় রাখতে পারলে হয়, হার্টফেল না করে হঠাৎ। তার সঙ্গে যে মাঝিটা ছিল, ঠিকঠাক হয়ে বসতে গিয়ে তার হাত লেগে হঠাৎ রাইফেলের নলটা একটু ঘষড়ে গেল মাচানের গায় ; তাতে যে শব্দ হল, তাই শুনেই বাঘটা একবার মাথা তুলে গম্ভীরসে তাকাল মাচানের দিকে। বাঘের চোখ আর কান, দুই-ই ভীষণ তীক্ষ্ণ। ডালপালার ফাঁক দিয়ে বাঘটাকে ওপরের দিকে তাকাতে দেখে মনো আর মাঝি, দু'জনেরই তখন হার্টফেল করার দশা। বাঘটা ওপরের দিকে তাকিয়ে কি বুঝল তা সেই জানে। দেখা গেল ওপরের দিকে তাকিয়েই সে যে দিক থেকে এসেছিল, আবার সেই দিকেই ফিরে গিয়ে জঙ্গলে গা ঢাকা দিল।

সকাল হতে যে যার মাচান থেকে নেমে এল, কিন্তু মনো আর তার সঙ্গী নামে না। বেলা সাতটার পর অনেক বলে-কয়ে নামান হল তাদের। মনোর মুখে বাঘের বর্ণনা শুনে মণি আর অজিত মনোকে বকাবকি করতে লাগল, "তুই এমন সুযোগ নষ্ট করলি, দশ গজের মধ্যে এমন একটা বাঘ পেয়েও গুলি করলি না! এরকম একটা রাজা বাঘের চামড়া হাত করার সুযোগ কি আর জীবনে পাবি!

অজিত পর পর অনেক কথাই বলে গেল, কিন্তু মনো কোন প্রতিবাদ করল না। মাঝে একবার শুধু মিনমিনিয়ে বলল, "রাইফেলের নল রাখার কাঠটা অত উঁচুতে বেঁধেছিলি কেন, নল অত উঁচুতে রেখে আমি গুলি করতে পারি? তুই লম্বা মানুষ তোর মাপে

তুই করেছিলি সেটা।"—বাঘের চেহারা দেখে নিজেদের বেসামাল হবার আসল কথাটা স্রেফ চেপে গেল।

অজিত মনোর কথা শুনে হা-হা করে হেসে উঠল। তারপরেই আবার হায় হায় করতে করতে বলল, "আরে, তুই নিজের সুবিধা মতো কাঠটা আগে থেকে নামিয়ে নিলি না কেন বোকা কোথাকার!"

পরের দু'দিন তারা বিশ্রাম নিল, আর খাড়িতে মাছ ধরে কাটাল। তিন দিনের দিন তারা আবার মাচানে বসল। এবার অজিত তার নিজের জন্য তৈরী সেই করঞ্জগাছের মাচানেই বসল। দরকার হতে পারে ভেবে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে কয়েকটা ছাগলও এনেছিল নৌকোতে। তারই একটা ছাগল বেঁধে রাখল তার গাছ থেকে দশ-পনর হাত দূরের একটা খুঁটিতে। কিন্তু পর-পর তিন দিন সমস্ত রাত মাচানে বসেও, বাঘের টিকি দেখা গেল না। মাঝে একদিন তারা দিনের বেলায় বন্দুক-রাইফেল বাগিয়ে ধরে জঙ্গলের ধারে ধারে ঘুরে বেড়াল, জঙ্গলের গভীরে যাবার সাহস ছিল না কারো। ঘোরাঘুরির সময় দু-একবার হরিণ-বরা নজরে পড়ল বটে, কিন্তু দলটার সৌভাগ্য, সেই বাঘের রাজার দেখা মিলল না। দ্বীপে ঘোরাফেরা করতে করতে তাদের ধারণা হল, সেখানে বাঘ ছিল একটাই। সেটা শিকারীদের মতলব বুঝতে পেরেই বোধ হয় কোন সুযোগে বড় জঙ্গলের ভেতরে গিয়ে লুকিয়েছে—জোয়ারের জল, কাঁটা ঝোপঝাপ আর সাপখোপের জন্য পশ্চিমের জঙ্গলের ভেতরের দিকটা ছিল মানুষের পক্ষে নিতান্তই দুর্গম!

অজিতের আপসোস যেন আর কাটতে চায় না, থেকে থেকেই সে মনোকে ধিক্কার দিতে থাকে তার মূর্খতা আর ভীরুতার জন্য—"বাঘটা মারতে পারলে, তোর নাম বাঘ শিকারের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকত চিরকাল।—পৃথিবীর সব থেকে বড় বাঘ মারার জন্যে তোর নাম করত সকলে।"

মনো কেবল চুপ করে শোনে। মনে মনে বলে, "গায়ে গুলি লাগত কি-না সন্দেহ; যদি লাগতও, মরত না নিশ্চয়ই ; আর তাহলে বাহার-জিঞ্জরা থেকে প্রাণ নিয়ে পালাতে পারত না কেউ-ই। রাতে হোক, দিনে হোক, দানোটা আমাদের সকলকেই খতম করত।"

দ্বীপের এদিকে-সেদিকে কয়েকটা নতুন মাচান তৈরী করল অজিত। টোপ হিসাবে দুটো ছাগলও রাখতে লাগল মাচানের কাছে, কিন্তু লাভ হল না কিছুই। একদিন মণি আর অজিত পরামর্শ করে ঠিক করল, তারা আর দু-রাত দেখে ফিরে যাবে বংশ-নগরে, অজিতের লাট-কাছারিতে। শেষ দিনের শেষ-রাত্তিরে অজিত আর মণি বাঘের দেখা পাবার আশা ছেড়ে দিয়ে দু'জনেই চুরুট ধরাল বেপরোয়া হয়ে। শিকারে বসে শিকারীরা সাধারণত ধূমপান করে না—তামাকের গন্ধে শিকার পালিয়ে যায়। ক'দিনের রাত জাগা, আর বসে থাকার ক্লান্তিতে তাদের ধৈর্য বলতে আর ছিল না কিছুই। কৃষ্ণপক্ষ চললেও, শেষ রাত্রির আকাশে তখনো চাঁদ আছেই। আর ঘণ্টা খানেক বাদেই তারা নেমে পড়বে মাচান থেকে, বাহার জিঞ্জরা দ্বীপকে সেলাম ঠুকে ফের নৌকোতে পাড়ি জমাবে লোকালয়ের দিকে। এক একবার তারা তাকিয়ে দেখছিল ছাগলটা কি করছে, আবার কখনো ডাইনে বাঁয়ে নজর চালিয়ে দেখে নিচ্ছিল বালির ফাঁকা জায়গার কোথাও কিছু দেখা যায় কি না। হঠাৎ একবার স্বপ্ন দেখার মত দু'জনেই একসঙ্গে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখে সেই রাজাটা বড় জঙ্গলের দিক থেকে বেরিয়ে এসে ফাঁকাতে দাঁড়িয়ে গেল, তাদের মাচান থেকে প্রায় দেড় শ' গজ দূরে। ব্যাঘ্ররাজ এই ক'দিনে শিকারীদের মাচান জিনিসটা চিনে ফেলেছে। অজিতদের মনে হল রাজাটা সেখানে দাঁড়িয়ে গিয়ে তাদের মাচানটাই লক্ষ্য করছে। একটু অস্পষ্ট হলেও বেশ বোঝা যাচ্ছিল তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ধরন—মাথাটা একটা বড় অ্যালুমিনিয়মের হাঁড়িবিশেষ ; একটা পাকা প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে আছে রাজকীয় ভঙ্গিতে।

মহারাজ যেন শেষ রজনীতে অতিথিদের বিদায় জানাতেই এসে দাঁড়িয়েছেন সেখানে। দু'জনের হাতেই তখন বুলেট ভর্তি বাঘা-বাঘা রাইফেল। রাইফেলের রেঞ্জ পাঁচ শ' গজের বেশি হলেও কিন্তু অজিত গুলি করতে সাহস করল না। মণি দত্ত তার রাইফেল তুলছিল, অজিত তার হাতে হাত দিয়ে থামিয়ে দিল। ফিসফিসিয়ে বলল, "দেবী বিশালাক্ষীর বাহন—ও বুঝে-সুঝেই আজ বেরিয়ে এসেছে। ওর যা জীবনী শক্তি, গায়ে গুলি লাগলেও ওর কিছু হবে না—ওকে মারা মানুষের কাজ নয়। কাল কেটে পড়ি চ', ঢের হয়েছে বাঘ মারা, আর বাঘ মারতে হবে না"—দু'জনেই হাত তুলে প্রণাম জানাল সেই ব্যাঘ্র-সম্রাটের উদ্দেশ্যে। বাঘটাও ধীরে ধীরে ঢুকে গেল পুবের জঙ্গলে। ছাগল দুটো বহাল তবিয়তেই জাবর কাটতে লাগল তাদের জায়গায়। বাঘটা ছাগলের মতো অখাদ্য খেতে ইচ্ছে করেনি বোধ হয়। তার রাজ্যে রাজভোগ ছিল মেলাই।

অল্পক্ষণের মধ্যে বড় একটা আগুনের গোলার মত সিঁদুর বরণ সূর্য মাতলার ভেতর থেকে মাথা তুলে প্রভাতের সোনালী আলো ছড়িয়ে দিল বানী-করঞ্জ-গামা গাছের মাথায় মাথায়। শিকারের সব সাজ-সরঞ্জাম গুটিয়ে নিয়ে মাচান থেকে নেমে এল অজিতরা।

আজও মাতলার মোহনায় জেগে আছে হ্যালিডে দ্বীপ। শীতের প্রভাতে এখনো মাতলার বুক থেকে সূর্য ওঠে, দ্বীপের বানী-গরাণ-করঞ্জ গাছের মাথায় মাথায় ছড়িয়ে দেয় তরল সোনা, গজমোতির মত গাছের পাতায় পাতায় ঝলমলিয়ে ওঠে শিশির বিন্দু। বাঘ শিকারে অজিতদের পরেও আরো অনেক শিকারী গিয়েছে সেই দ্বীপে। সকলেই বলে ঐ দ্বীপে মাত্র একটাই বাঘ আছে, আর সে অমর। বাহার-জিঞ্জরায় গেলে আজও হয়ত দেখা যাবে বাঘটা সেখানে চরে বেড়াচ্ছে আগের মতই স্বচ্ছন্দে। তার ঘাড়ে আর গলকম্বলের জায়গায় জায়গায় এতদিনে হয়ত দেখা দিয়েছে মঠ-মন্দিরের সন্ন্যাসী-মহারাজদের মত পাকান জটা। সে কালও ছিল, হয়ত আজও আছে, আর কালও থাকবে ত্রিকালের সাক্ষী হয়ে!

আমার শেষ শিকার



তখন আমি একটা বদলির চাকরীতে রাজকোটে ছিলাম। রাজকোট গুজরাট রাজ্যের একটি নামকরা জেলা-শহর। শহরের পুবে রয়েছে

আজি নদী। আজি শহর থেকে পাঁচ-সাত মাইল উত্তরে একটা বাঁক নিয়ে চলে গিয়েছে কচ্ছ-উপসাগরের দিকে।

আমার ছিল ভীষণ শিকারের সখ। আমার টিপও ছিল দারুণ! কিন্তু ভারী-শিকার নয়। শিকারের সখ মেটাতে গিয়ে আমি কোন ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিলাম না। আমার লক্ষ্য ছিল হরিতাল, তিতির, ময়ূর, খরগোশ, বড় জোর চিতল কিম্বা কুটরা হরিণ। একদিন বেলা একটার দিকে আপিস থেকে জিপ নিয়ে পালিয়ে এলাম আমার কোয়ার্টারে তিতির-শিকারে যাব বলে। তিতিরের মাংস অতি চমৎকার, অপূর্ব তার স্বাদ আর গন্ধ। তিতির নানা চেহারার নানা রকমের হয়। এক রকম তিতির হয় কালচে রঙের, তার পালকের মাঝে-মাঝে থাকে সাদা ফুটকি বা দাগ দাগ। মাথা, ঠোঁট, আর পা অনেকটা পায়রার মতো। ডানা আর ল্যাজ ছোট বলে ভাল উড়তে পারে না, কিন্তু মাটির ওপর দিয়ে ছুটতে পারে জোরে। তিতিরের বাচ্চা ডিম থেকে বেরিয়েই জোরে ছুটাছুটি করে। পাখিগুলো খুব সাহসী আর বেশ চালাক। বাচ্চাদের রক্ষা করতে গিয়ে বড় পাখিরা জোরসে তেড়ে যায় শত্রুর দিকে, নয়ত ডানাভাঙা পাখির মতো ঢং করে পড়ে থাকে মাটিতে। ধরার জন্যে শত্রু তার দিকে এগিয়ে আসতে থাকলে বাচ্চাগুলো সেই সুযোগে পালিয়ে যায়, আর নিজেও সময় বুঝে কিছুটা উড়ে, কিছুটা ছুটে পালিয়ে যায় শত্রুর নাগালের বাইরে।

লাঞ্চ সেরে আমার টেন-সট পয়েন্ট টু-টু রাইফেল আর তার বুলেট সঙ্গে নিয়ে আমি জিপে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় নজরে পড়ল বিনা নোটিশে আমার দু'মাসের শিশুপুত্রকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে তার মা-জননী আমার পিছনে দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসছেন। আমার এই এক ভীষণ মুশকিল—এই শিশুকে নিয়ে আমার সংসারে আমরা তিনটি প্রাণী। ওদের জন্যে আমার একলা কোথাও বেরোবার উপায় ছিল না। অগত্যা আজও আমার সম্পূর্ণ সমষ্টি নিয়েই জিপে

উঠলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল আজি নদীর উত্তরের বাঁকটার কাছাকাছি গিয়ে নদীর চড়ায় চড়ায় কিছু তিতির শিকার করা, আর সুযোগ পেলে দু'একটা ক্রেক, কোয়েল মারা। শহর থেকে যে রাস্তাটা ঘুরে-ফিরে মোরভি স্টেটের দিকে গিয়েছে, আমাদের জিপ চলল সেই রাস্তা ধরে। রাস্তার ধারে ধারে চাষের খেত ; চাষ শুরু হলেও বেশির ভাগ জমিই পড়ে আছে অনাবাদী। গুজরাটের জমি খুবই সুফলা ; বারমাসই তাতে ফসল ফলে—বর্ষাকালে বর্ষার জলে, অন্য সময়ে ইঁদারার জলে। জায়গায় জায়গায় গজিয়ে রয়েছে নানা জাতের ক্যাকটাস, তবে কাঁটা-ক্যাকটাসই ছিল বেশি। মাঠে চরে বেড়াচ্ছে অসংখ্য পায়রা। এদিকে সেদিকে ঝোপের মাথায় দু'একটা ময়ূর আর হরিতাল বসে আছে অলস ভাবে। কাদাখোঁচার ঝাঁক হৈ-চৈ করছিল ঝোপের আশপাশে। গুজরাট দেশটা মোটের ওপর নিরামিষাশী। ওয়াগরী (বাগরী) নামের হিন্দুদের মাত্র একটা জাত ছাড়া সেদিকের স্থানীয় আর কোন হিন্দুই আমিষ স্পর্শ করে না। পায়রা মারা সেদিকে বারণ। নিরামিষাশীর দেশ বলেই বোধ হয় ওদিকের বন-বাদাড়ে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ায় পি-ফাউল, গ্রিন পিজিয়ন, আর খরগোশ। তেমনি নদীর ধারের খেতে আর জলে চরে বেড়ায় বিস্তর তিতির, সারস, জল মুরগি, হুকনা, ক্রেক, কোয়েল, নানা জাতের বটের-বাটান-টীল। সৌরাষ্ট্রকে বলা যায় পাখিদের অভয়াশ্রম।

নদীটার চড়ায় পৌঁছোতে তখনো মাইল খানেক বাকি ; রাস্তা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। নদীর দিকে বাগরীদের একটা গ্রাম দেখা যাচ্ছে। সেই গ্রাম আর আমাদের জিপের মাঝে ছিল কিছু চাষ করা জমি আর একটা ইঁদারা। ইঁদারার ওপরের যে পাকা কড়িটা থেকে কপিকল ঝোলান ছিল, তার ওপরে সারি দিয়ে বসেছিল কয়েক জোড়া হরিতাল। ইঁদারাটা দূরে থাকতেই জিপের স্টার্ট বন্ধ করে দেওয়া হল, যাতে জিপের শব্দে ভয় পেয়ে হরিতালগুলো

উড়ে না পালায়। আমি একলাই জিপ থেকে নেমে পড়লাম কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে। রাইফেলের ম্যাগাজিনে আগে থেকেই বুলেট ঠাসা ছিল দশটা। আমি যতটা পারা যায় মাথা নীচু করে কাঁটা ঝোপঝাড়ের আড়ালে আড়ালে এগিয়ে গেলাম ইঁদারার দিকে। ইঁদারাটা যখন প্রায় পঞ্চাশ গজের মধ্যে এসেছে, আমি একটা ঝোপের ধারে বসে হরিতালগুলোর দিকে রাইফেল তাগ করব মনে করছি, ঠিক তখনই আমার ডান পা-টা কিসে যেন আটকে গেল, আমি হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতে যেতে অল্পের জন্যে বেঁচে গেলাম। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি মাটিতে পাতা রয়েছে প্রায় ছ'ইঞ্চি খাড়া কালো রঙের একটা জাল। বুঝলাম বাগরীরা সেটা শশলু ধরার জন্য ঐভাবে পেতে রেখেছে। ওরা খরগোশকে বলে শশলু। ঝোপের ধারে এই রকম জাল পেতে রেখে ওরা পেছন থেকে খরগোশকে তাড়িয়ে নিয়ে আসে জালের দিকে ; তাড়া খেয়ে জালের মধ্য দিয়ে পালাতে গিয়ে সেগুলো আটকা পড়ে যায় জালের ফাঁসে। কোন রকমে সামলে নিয়ে একটা ঝোপের ধারে বসে রাইফেল চালালাম ওপরের দিকে। একটা হরিতাল ছিটকে পড়ল ইঁদারার পেছনে, আর সঙ্গে সঙ্গে চারদিকের মাঠ থেকে হাজার-খানেক পায়রা ডানা ঝটপটিয়ে ছড়িয়ে পড়ল আকাশে।

আমি যখন পাখিটা কুড়িয়ে নিয়ে জিপের দিকে ফিরছি, দেখি শ্রীমতী তাঁর পেয়ারের পোষ্যটি কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন রাস্তার ওপরে। আমি একটু দূরে থাকতেই তিনি আঁৎকে উঠে চিৎকার করে বলে উঠলেন, "অ্যাঁ, তুমি পায়রা মেরেছো, দেখবে এখন কি হাঙ্গামাটা হয়!"

আমি কাছে যেতে অবশ্য তাঁর ভুল ভাঙল। আমরা আবার জিপে উঠে নদীর দিকে এগুতে লাগলাম। কিন্তু আর কিছু দূর গিয়েই গাড়ী থামাতে হল। রাস্তা খারাপের জন্যে জিপ আর চলল না। এবার শ্রীমতী আমার সঙ্গেই থাকবেন বলে জিপ থেকে

নেমে পড়লেন চটপট। গুলি আর জিপের শব্দ পেয়ে এদিক সেদিক থেকে পঁচিশ-ত্রিশ জন বাগরী ছেলে-মেয়ে আমাদের ঘিরে ধরল। তাদের সকলেরই শিকারে খুব উৎসাহ। তারা বলতে লাগল, "সাহেব, তোমাকে ভাল ভাল পাখির জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি চল, কিন্তু সাহেব আমাদের ছুটো ডেল মেরে দিতে হবে।"—ময়ূরকে সেদিকে ডেল বলে। আমি ওদের কথা শুনে মনে মনে ভয় পাই। ময়ূর এখন আমাদের জাতীয় পাখি। দূরে দূরে ময়ূর দেখা যাচ্ছিল বটে, কিন্তু জাতীয় পাখি মারি কি করে—ময়ূর মারা যে দেশের আইনে অপরাধ! তাদের ওপর বিশেষ নির্ভর না করে আমরা নিজেদের ইচ্ছা মতো চলতে লাগলাম নদীর ধারে ধারে। যে দিকে যাচ্ছিলাম, সেটা নদীর উজান না ভাটি বলা কঠিন। জায়গায় জায়গায় বাঁধ ছিল বলে নদীটার গতি ঠিক কোন দিকে ছিল বোঝা যাচ্ছিল না, তবে দিক হিসাবে বলা যায় আমরা বোধ হয় কিছুটা পশ্চিম দিকেই যাচ্ছিলাম—সূর্য ছিল আমাদের সামনের দিকে। নদীটার খাত সেখানে বেশ চওড়া আর গভীর, কিন্তু গভীর হলেও জল ছিল খুব কম, এত কম যে নদীর নীচের দিকের পাথর পর্যন্ত নজরে পড়ছিল। নদীর ছুই পারের চড়াকে পাহাড়ের গায়ের চাযের খেতের মতো থাক থাক করে অনেক চাযের জমি তৈরী করা হয়েছে। একটা থাক থেকে আর একটা থাক প্রায় চার ফুট নীচে বা ওপরে। বেশির ভাগ জমিতেই চাষ হয়েছে। শাক-সবজি ফুটি-তরমুজের চাষও আছে, আবার জোয়ার বাজরার আবাদও আছে। যে জমিতে তখনো চায হয় নি, কিছু কিছু আগাছার ঝোপ হয়ে আছে তাতে।

বাগরীদের দলটা আমার সঙ্গেই ছিল শিকার দেখবে বলে। কেউ কেউ অতি উৎসাহে এগিয়ে যাচ্ছিল আমাকে ছাড়িয়ে। বার-বার ওদের বলছিলাম, "তোরা আমার সামনে যাসনে কেউ, পেছনে যা", কিন্তু কে কার কথা শোনে। পেছনে থাকতে থাকতে আবার এগিয়ে যায়। মাঝে মাঝে চাযের জমিতে তিতির দেখতে পাচ্ছিলাম,

কিন্তু সবজি গাছের জন্য তাগ করায় অসুবিধা ছিল। জিপ থেকে তিন-চার শ' গজ চলে এসে আমি একটা ফাঁকা খেতের কাছে দাঁড়িয়ে গেলাম। মনে হল খেতটার এক দিকের একটা ঝোপে তিতির আছে। এই খেতটার চারদিকের জমিতেই চায হয়েছে, কোনটায় বাজরা, কোনটায় সবজি। যে ঝোপের মধ্যে তিতিরটা আছে মনে করছিলাম, আমি সেই দিকে রাইফেল উঁচিয়ে দাঁড়ালাম। বাগীরা আর আমার গোষ্ঠীর কে যে কোথায় আছে, সেরেফ ভুলে গেলাম। কয়েক সেকেণ্ড সেইভাবে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ দেখি পাখিটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে বোঁ-বোঁ করে মাঠটার কোণাকোণি ছুটতে লাগল। তিতিরটা যখন মাঠটার মাঝামাঝি এসেছে, আমি তখন শিকারের উত্তেজনায় আত্মহারা। বাঘ মারছি না পাখি মারছি, সেকথা আর তখন মনে ছিল না। শিকারীর কাছে বন্দুক দিয়ে বাঘ আর পাখি মারার উত্তেজনা বোধ হয় সমান, যেমন পুকুরে ছিপ ফেলে টান মারার সময় কি বড় মাছ, কি ছোট মাছ, মনের অবস্থা হয় একই রকম। পাখিটাকে ছুট লাগাতে দেখেই আমিও সঙ্গে সঙ্গে আমার রাইফেলের নল ঘুরিয়ে নিয়ে মাঠের মাঝামাঝি চলন্ত পাখিটাকে লক্ষ্য করে ট্রিগারে টান দিলাম। ঠিক সেই মুহূর্তেই দেখি তিতিরের মাঠটার নীচের মাঠে একজন লোক হঠাৎ ভূতের মতো আমার রাইফেলের সামনের দিকে উঠে দাঁড়াল। রাইফেলের মুখে লোকটাকে দেখে আমার সমস্ত শরীর তখন থরথর করে কাঁপছে। ট্রিগার তখন টানা হয়ে গিয়েছে, আমার আর তখন করার ছিল না কিছুই। আতঙ্কে আপনা থেকেই আমার হাতের রাইফেলটা মাটিতে খসে পড়ল। ওদিকে গুলির শব্দ হতেই লোকটাও ঝট করে অদৃশ্য হল নীচের দিকে। পাখিটার গায়ে গুলি লাগল কি-না বোঝা গেল না ; ছুটে গিয়ে সেটা ঢুকে পড়ল মাঠটার আর এক ধারের একটা ঝোপের মধ্যে। তিতিরটার কি হল সেদিকে লক্ষ্য না করে, সেই ভূতটা যেখানে দেখা গিয়েছিল, কিছুক্ষণ সেই দিকে হাঁ হয়ে তাকিয়ে

থাকলাম ; তারপর ফাঁকা মাঠটায় নেমে পড়ে ছুটলাম সামনের দিকে। মাঠটা পেরিয়ে দেখি নীচের দিকে জড়সড় হয়ে বসে আছে পঁচিশ-ত্রিশ বছরের একটা রোগা বাগরী। লোকটাও তখন ভয়ে কাঁপছে। সিঁড়ির ধাপের মতো জমিগুলোর কোন একটার ওপর দিয়ে মাথা নীচু করে চলে এসেছিল আমার সামনের দিকের ঐ জমিতে, শিকারের মজা দেখবে বলে। লোকটা বোধ হয় নিজেও বুঝতে পারে নি যে সে চলে এসেছিল একেবারে আমার রাইফেলের সামনে। অবশ্য আমার রাইফেলের নিশানা ছিল মাটির দিকে, পাখির গায়ে গুলি লাগুক আর না-ই লাগুক, লোকটার গায়ে সরাসরি গুলি লাগত না নিশ্চয়ই। তবে কোন পাথর-টাথর থেকে গুলি ছিটকে গিয়ে তার গায়ে লাগলেও লাগতে পারত। লোকটাকে যখন কষে বকান দিচ্ছি, সেই সময় কয়েক জন বাগরী ডানা ধরে আমার তাগ করা পাখিটা নিয়ে এল আমার কাছে। পাখিটা নাড়াচাড়া করে দেখি সেটা লম্বায় প্রায় পনর ইঞ্চি ; মাথায় একটা সাদা দাগ, আর গলার চারদিকে একটা বাদামী বেল্টের মতো ; সমস্তটা শরীর কালচে, পিঠের নীচের দিকে সাদা দাগ-দাগ। বুঝলাম সেটা একটা পুরুষ তিতির। পালক-চামড়া সুদ্ধ ওজন হবে আধসেরের কিছু বেশি। গুলিটা লেগেছে তার বুকের এক ধারে, ফুসফুস ছুঁয়ে বেরিয়ে গেছে। গুলি খেয়েও পাখিটা ছুটে গিয়েছিল ঐ দিকের ঝোপে। আমি যখন ভূত-বাগরীটার দিকে ছুটে যাচ্ছিলাম, কিছু লোক তখন ছুটে এসেছিল আমার দিকে, আর কিছু ছুটে গিয়েছিল ঐ ঝোপটার দিকে—ওরা দেখে ঝোপের ভেতরে মরে পড়ে আছে পাখিটা। তখনো রক্ত ঝরছিল তার বুক থেকে। রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছিল তার কালো পালক।

বাগরীদের কিছু বকশিস দিয়ে পাখিটা হাতে করে ফিরে এলাম জিপে। আমি কিন্তু তিতিরটা গুলি করার সময়ের সেই লোকটার কাণ্ডমাণ্ডর কথা ভুলতে পারছিলাম না কিছুতেই—বার বার চোখের

সামনে ভেসে উঠছিল তার পাগলামোর দৃশ্য। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল পাগলাটা আজ আমাকে মানুষ খুনের দায়ে অপরাধী করতে যাচ্ছিল ; কেলেঙ্কারির একশেষ হত একটু এদিক-ওদিক হলেই—কোন্ পুণ্যে যেন আজ বেঁচে গেলাম। না, একেবারে বেকসুর রেহাইও পেলাম না। ফেরার পথে এক সময় লক্ষ্য করলাম আমার পরিবারের সেই ছ'মাসের শিশুটির গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে। শহরে ফিরতে আমাদের সন্ধ্যে হয়ে গেল। আমরা কোয়ার্টারে না ফিরে সোজা চলে গেলাম আমাদের ইউনিট হাসপাতালে। রেসিডেন্ট মেডিক্যাল অফিসার পরীক্ষা করে বললেন, "সানস্ট্রোক, খুব সাবধানে রাখবেন বাচ্চা"। ডাক্তারের কথা শুনে আমি চমকে উঠলাম। মাথার মধ্যে কেমন সব এলোমেলো চিন্তা এসে পড়ল—আমি এক স্ট্রোকে একটা হরিতাল আর এক স্ট্রোকে একটা তিতির মেরেছি, পবিত্র মাটিতে রক্ত ঝরিয়ে পরিবেশ কলুষিত করেছি। এখন আমাদের ওপর একটা স্ট্রোক হলে বলার কী থাকতে পারে! আমার চোখের সামনের উজ্জ্বল ইলেকট্রিক-আলোগুলো সব ক্রমশ লেপটে একাকার হয়ে গেল। আমি মানস-দৃষ্টিতে দেখতে লাগলাম একটা প্রাণ-ভয়ে ব্যাকুল তিতির একটানা ছুটে চলেছে মাঠের মধ্য দিয়ে, আর পাগল বাগরীটা আমার তাগ করা রাইফেলের সামনে নীচের দিকের একটা ধাপ থেকে ভূতের মতো মাথা তুলছে বার বার। এক অবর্ণনীয় অন্তর্যাতনায় অভিভূত হল আমার মন প্রাণ। অমন যে সুস্বাদু হরিতাল আর তিতির, আমার তখন মনে হচ্ছিল সে সব যেন বিষ, অস্পৃশ্য!

তিন-চার দিন নানা রকম খেল দেখালেও কিন্তু আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত আর শ্রীমান আমাদের মায়া কাটাতে পারল না। ভূত-বাগরীটার আর আমাদের ক্ষুদ্র ভদ্রলোকটির ভেলকি দেখে সেবার আমি যে শিক্ষা পেলাম, তারপর আমি আর বন্দুক-রাইফেল স্পর্শ করিনি কখনো। সেই তিতিরটাই ছিল আমার জীবনের শেষ-শিকার।